BDeBooks.com

Read Online

pdf

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com

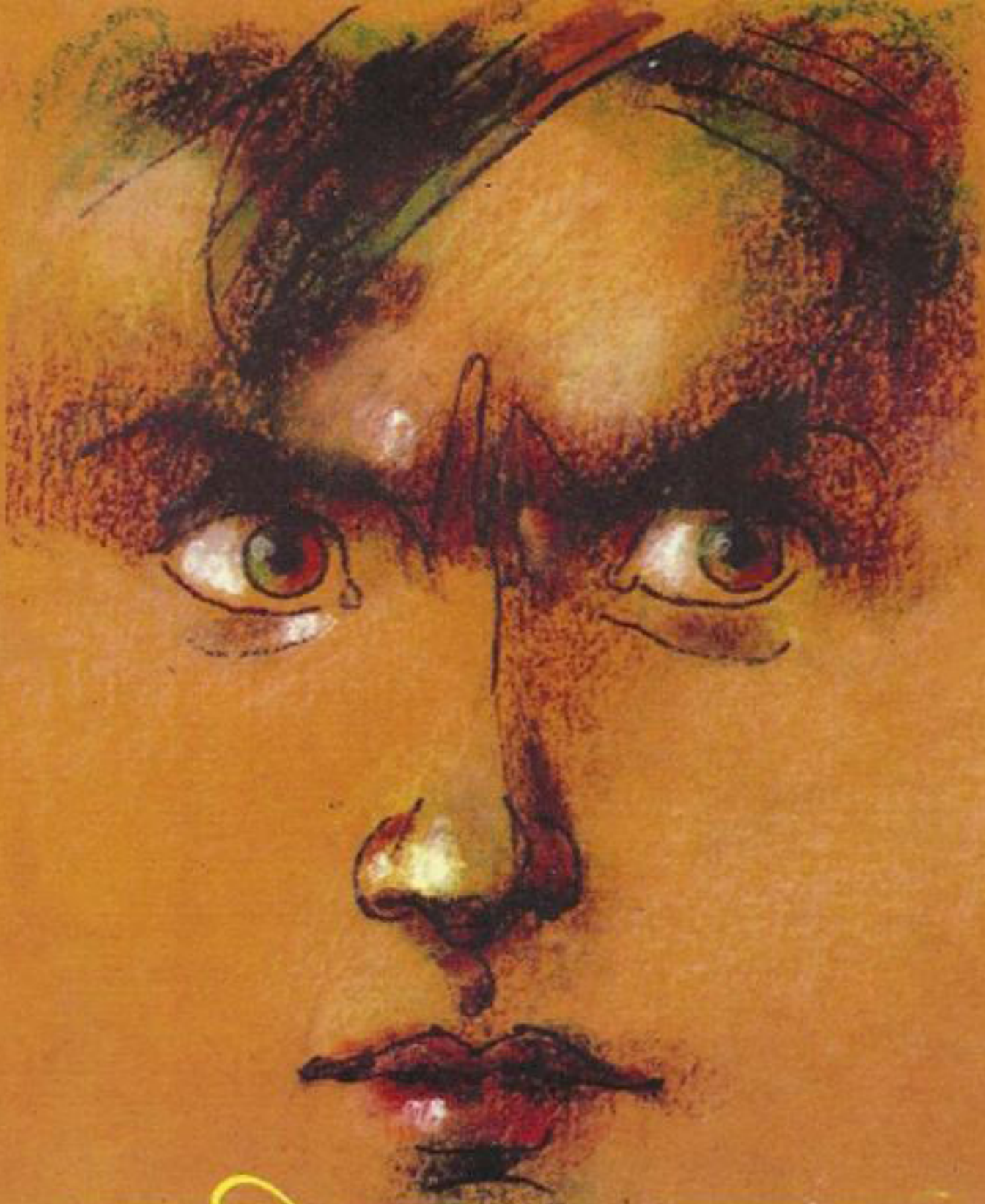

আমি আর ফেলুদা

আমি আর ফেলুদা

অনুলিখন

সেবাব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

ফেলুদার স্রষ্টাকে

গোড়ার কথা

ফেলুদার ছবির শুটিংয়ের নানা মজার কাহিনি নিয়ে বাবা দুটো প্রবন্ধ লিখেছিলেন সন্দেশ পত্রিকার জন্য। 'উট বনাম ট্রেন' এবং 'ফেলুদার সঙ্গে কাশীতে'। পরে 'একেই বলে শুটিং' বইয়ে ওই দু'টি রচনা সংকলিত হয়। 'সোনার কেল্লা' এবং 'জয় বাবা ফেলুনাথ' ছবি নিয়ে লেখা এই দুটি প্রবন্ধই কিন্তু সচেতনভাবে পুরোপুরি শুটিংয়ের বিবরণ। অর্থাৎ ফেলুদার গল্প লেখার 'ব্যাকগ্রাউন্ড' সেখানে গরহাজির। আমার তাই বহুদিন ধরেই মনে হত, চলচ্চিত্রের পাশাপশি ফেলুদার সৃষ্টি ও তার বিভিন্ন কাহিনি রচনার নেপথ্যকথা যদি কোথাও একসঙ্গে বলা যায়, ফেলুদা ফ্যানদের কাছে সেটা একটা অত্যন্ত মূল্যবান সংগ্রহ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তবে লেখার কাজটা সময়-সুযোগের অভাবেই হয়ে উঠছিল না।

এর পরে আমি নিজেই ফেলুদাকে নিয়ে ছবি তৈরি করতে শুরু করি। প্রথমে টেলিফিল্ম, টিভি সিরিজ এবং তারপর পুরোদস্তুর চলচ্চিত্র। বাবার তৈরি ফেলুদার শেষ ছবি 'জয় বাবা ফেলুনাথ' মুক্তি পাওয়ার সিকি শতাব্দীরও বেশি সময় পরে 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে' কাহিনি অবলম্বনে আমার ছবিটা রিলিজ করে। এর আগে ফেলুদাকে নিয়ে টেলিভিশনের জন্য তোলা আমার সমস্ত ছবিই বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল, কিন্তু বোম্বাইয়ের বোম্বেটের দুর্দান্ত সাফল্য আমাকেও স্তম্ভিত করে দেয়। ফেলুকে নিয়ে আরও কয়েকটা ছবি তৈরির কথা এর পরেই আমি ভাবতে বসি।

প্রায় সেই সঙ্গেই আরও একটা ঘটনা ফেলুদাকে নিয়ে আমার বই লেখার পুরনো পরিকল্পনাটাকে আবার চাঙ্গা করে তোলে। সুখী গৃহকোণ পত্রিকার তরফ থেকে ফেলুদার কাহিনি ও চলচ্চিত্র তৈরির নেপথ্যকথা ধারাবাহিকভাবে লেখার প্রস্তাব আসে। সেই সময়টা সদ্য বোম্বাইয়ের বোম্বেটে রিলিজ করেছে, বেশ ব্যস্ততা ছিল। লিখতে বসার সময় নেই বললেই চলে। তাই ঠিক হয় ফেলুদা নিয়ে যাবতীয় তথ্য ও ঘটনা আমি যতটা সম্ভব স্মরণ করে কাউকে বলব, ধারাবাহিকটা আমার হয়ে লিখবেন তিনি। বিদেশে এইভাবে ভূরিভূরি বই লেখা হয়। তবে ফেলুদাকে নিয়ে এইভাবে লেখার ক্ষেত্রে আমার মনে বেশ সংশয় ছিল। ভয় একটা কারণেই, লেখার বিষয় ফেলুদা। আমার কাছ থেকে সব শুনেটুনেও লেখক মশাই যদি তাঁর কাজে ভুল করতে থাকেন, যদি বিষয়টায় তাঁর উৎসাহ না থাকে, তবে ফেলু-ভক্তদের যাবতীয় অভিশাপের শিকার আমাকেই হতে হবে, কারণ লেখাটা বেরোবে আমার নামে। কী করা যায়?

শেষে যা থাক কপালে বলে ঝুঁকিটা নিয়েই নিলাম। কারণ আমার বারবার মনে হচ্ছিল, ফেলুর 'এই বয়সেও' যখন এতটা 'পুল' রয়েছে, তখন স্রেফ ফেলু-ভক্তদের মুখ চেয়েই এই লেখাটায় হাত দেওয়া উচিত। অবশ্য অনুলিখনের কাজটা যিনি করতে এলেন, তাঁকে

দেখে একটা ব্যাপারে ভরসা হল। কেমন লেখেন তা না জানলেও, তিনি যে একজন উৎসাহী ফেলু-ভক্ত, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ ছিল না।

ওঁকে আমি চিনি সেই বাক্স রহস্য টেলিফিল্ম তৈরির সময় থেকেই। সেই সময়ে একটা বাংলা ওয়েব-ম্যাগাজিনের পক্ষ থেকে উনি আমার কয়েকটা সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। পরে আমাকে টেলিফোন করে জিজ্ঞাসা করেন, লেখাগুলোকে সাক্ষাৎকারের আদলে তৈরি না করে আমার বাইলাইনেই পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধের আকার দিলে কেমন হয়? আমি সম্মতি দিয়েছিলাম। কেন দিয়েছিলাম মনে পড়ে না। সম্ভবত প্রিন্ট মিডিয়ার জন্য লেখা হলে এতটা স্বাধীনতা চট করে কাউকে দিতাম না। ওয়েব-ম্যাগাজিনের পাঠক সংখ্যা তখন অত্যন্ত কম। পুরোটাই অনাবাসী রিডারশিপ। অনুলেখক ভুলচুক করলেও খুব বেশি লোকের চোখে পড়বে না, ফেলু-ভক্তদের তো নয়ই, সম্ভবত এমনই কোনও যুক্তি মাথায় ছিল। পরে কিন্তু লেখাগুলো পড়ে দেখেছিলাম, উৎরে গেছে। এর চেয়ে বেশি প্রত্যাশা ছিল না, কারণ ওয়েব ম্যাগাজিনটা হাত খুলে লেখার জায়গা নয়। সেই লেখাগুলো বেরিয়েছিল 'ফেলুদা আর আমি' শিরোনামে। অর্থাৎ এই বইয়ের যে নাম, তার ঠিক 'মিরর ইমেজ'! তখন বোধ হয় মোট চারটে পর্ব প্রকাশিত হয়েছিল।

সেই একই অনুলেখক, অর্থাৎ সেবাব্রতকে এবারেও দেখে কিছুটা নিশ্চিন্ত হই। তবে এবারে কাজটা অনেক বড় ছিল। ফেলুদাকে ঘিরে অনেক বেশি তথ্য ও ঘটনা আমাকে স্মরণ করতে হয়েছে। সময় দিতে হয়েছে প্রচুর। রীতিমতো রিসার্চই করা হয়েছে বলা যায়। লেখার ক্ষেত্রেও উনি আমার নিজের লেখা ও কথা বলার ভঙ্গি রীতিমতো তুলে এনেছেন। ফেলুদার সমস্ত গল্প ও উপন্যাসের সম্পদ যে অলংকারহীন স্মার্ট বাংলা গদ্য, সেই ভাষাকেও যতদূর সম্ভব অনুসরণ করার চেষ্টা করেছেন।

ধারাবাহিকটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। গত বছরই এটি বইয়ের আকারে সংকলিত হতে পারত। কিন্তু এই ২০০৫ সালের ডিসেম্বর মাসেই ফেলুদা সৃষ্টির চল্লিশ বছর পূর্ণ হচ্ছে। অর্থাৎ এ বছরেই হল ইভেন্ট—ফেলুদা ফর্টি। এ বছরটা স্মরণীয় করে রাখতে ফেলুদার 'টিনটোরেটোর যীশু' উপন্যাসটা নিয়ে চলচ্চিত্র তৈরিতে হাত দিচ্ছি। ইভেন্টের অঙ্গ হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে এই বইটাও। এখন পাঠকদের ভাল লাগলেই যাবতীয় উদ্যোগ সার্থক হয়।

সন্দীপ রায়

১/১ বিশপ লেফ্রয় রোড
কলকাতা
ডিসেম্বর, ২০০৫

আমি আর ফেলুদা

সূচি

কিস্‌সা কাঠমাণ্ডু কা: হিন্দি ফেলু বাংলায় ফেল ১

বাক্স রহস্য: টাফ্ ফেলুর পয়লা টক্কর ৮

একঝপ্পা স্টান্ট মাস্টার ১৮

জটায়ু'রা ২২

মগনলাল মেঘরাজ! ৩৫

বোম্বাইয়ের বোম্বেটে: ট্রেনের সঙ্গে ফের দৌড় ৪২

ছবি তুলতে কত তোড়জোড় ৪৭

বাবা আর ফেলুদা ৫৪

সোনার কেল্লার ক্লাইম্যাক্সে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। 'ফেলুদা' নামটা শুনলেই বাবার আঁকা ইলাস্ট্রেশনের পাশাপাশি এই ছবিটাই প্রথম চোখে ভাসে।

কাঠমাণ্ডুর রাস্তায় বাঙালির অতি প্রিয় 'ট্রায়ো'। অলংকার, শশী এবং মোহন আগাসে। তবে কম্বিনেশনটা ক্লিক করেনি। ছবির ভাষা হিন্দি হওয়াটাও ব্যর্থতার বড় কারণ।

কাঠমাণ্ডুর হোটেলে শশী কাপুর ও অলংকার। ফেলুদা ও তোপসের ভূমিকায়।

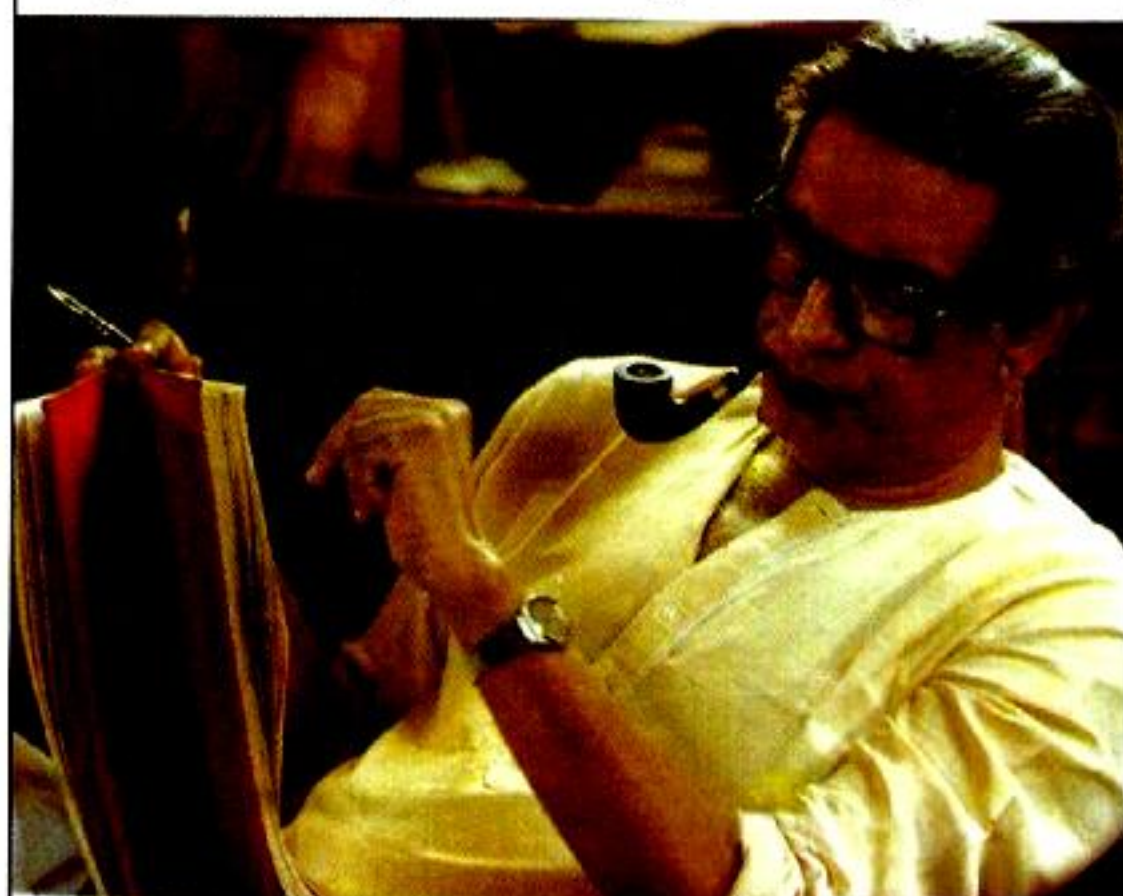

অতি পরিচিত ভঙ্গিতে বাবা। বাবার ঘরে ঢুকলে এই দৃশ্যটার অনুপস্থিতিই চোখকে পীড়া দেয়। চিরকাল দেবে।

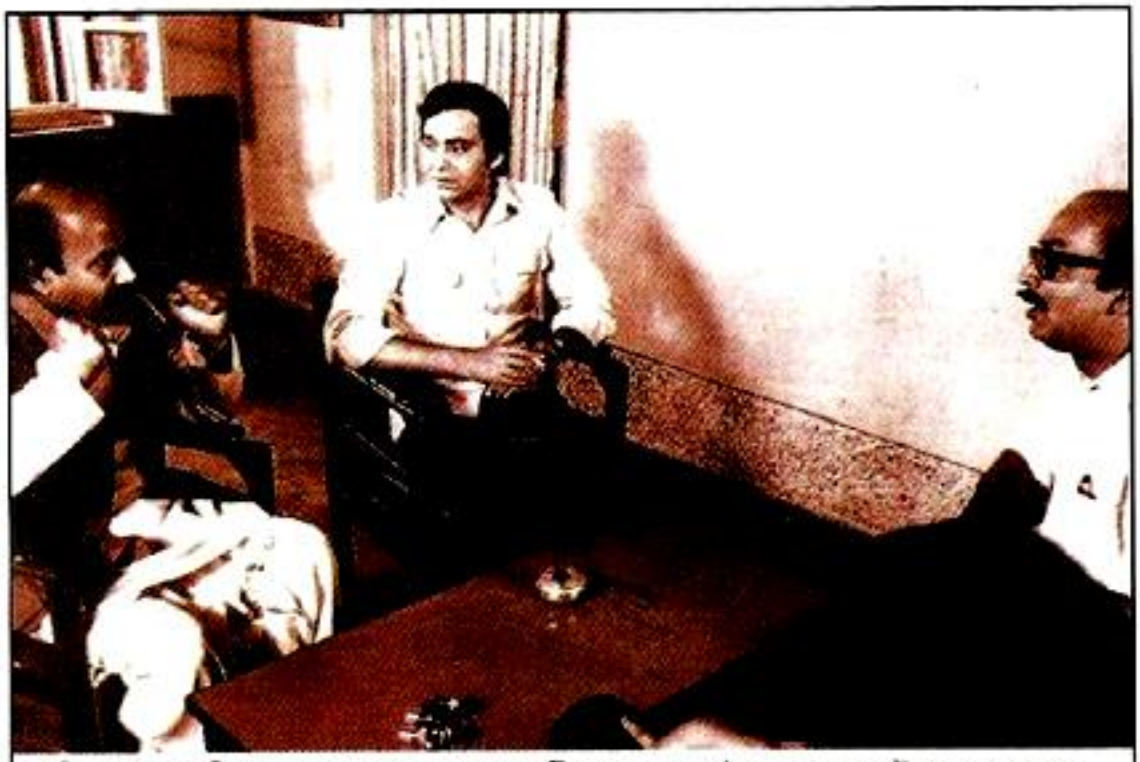

সাহিত্য ও চলচ্চিত্রে ফেলুদার সাফল্যের পিছনে অনেকটা অবদান জটায়ুর। আবার জটায়ুর চরিত্রে সন্তোষদা ছাড়া অন্য কাউকে ভাবাটাও শক্ত। সন্তোষদার অভিনয় পরের জটায়ুদের কাছে বিরাট চ্যালেঞ্জ খাড়া করে দিয়েছে।

জটায়ুর ভূমিকায় মোহন আগাসে চেষ্টা করেছিলেন আপ্রাণ। কিন্তু ফেলু-ভক্তরা তাঁকে মেনে নেননি।

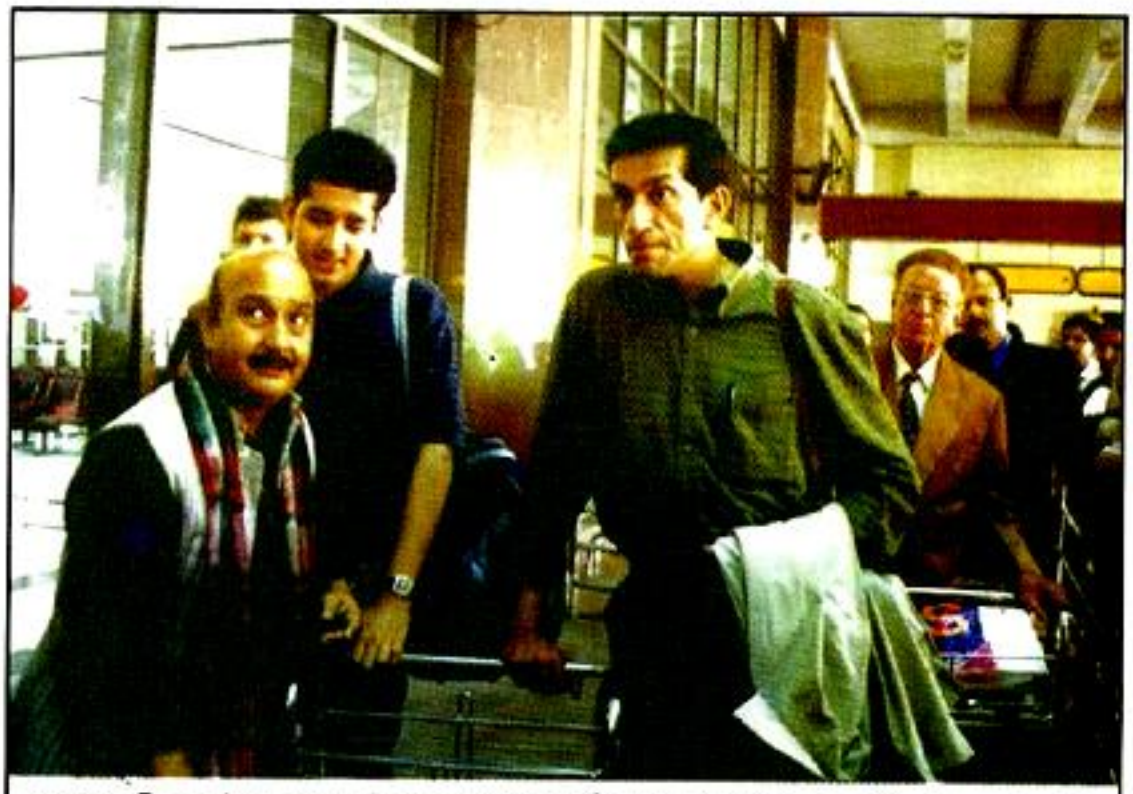

বাবার ছবির চেনা ছকের বাইরে সুপারহিট ত্রয়ীর 'ডেবিউট'। সব্যসাচী, পরমব্রত এবং বিভুদা। বোম্বাইয়ের বোম্বেটে ছবিতে।

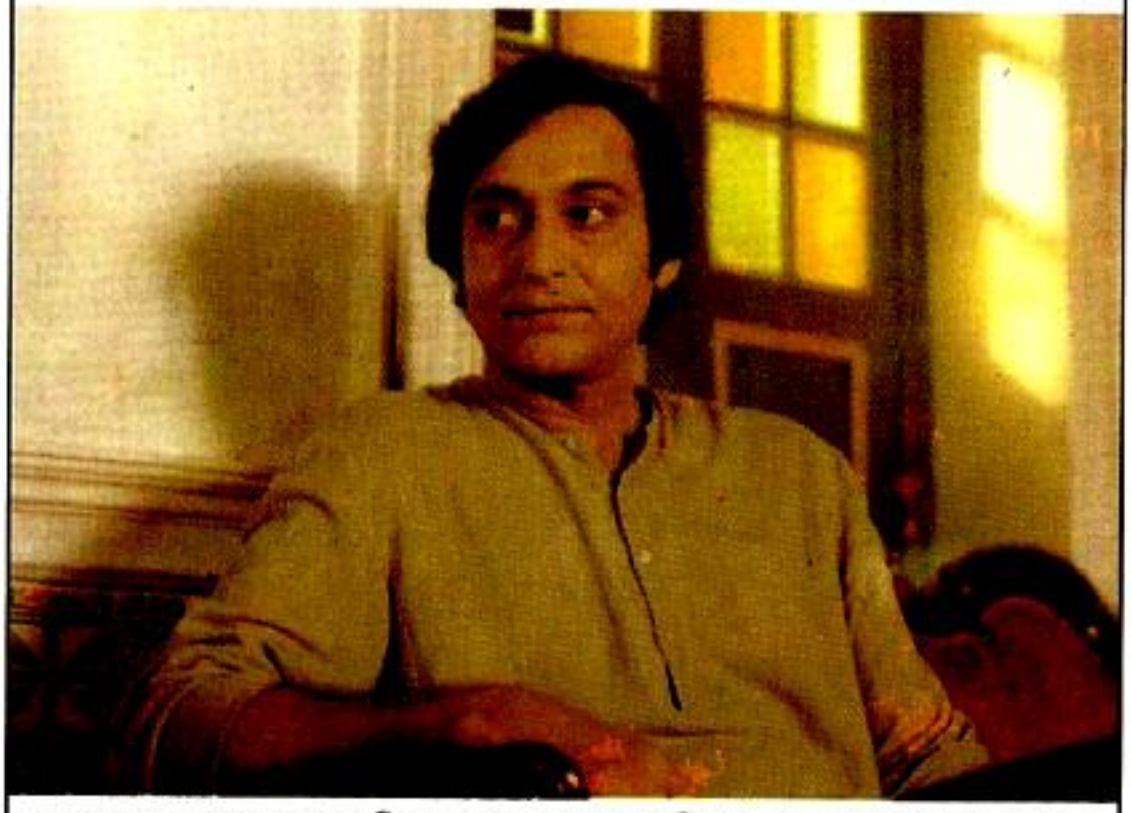

শুধু গোয়েন্দা নয়, ফেলুর চরিত্রে আপাদমস্তক বাঙালি এক অত্যন্ত বুদ্ধিমান যুবকের কথা ভেবেছিলেন বাবা। চরিত্রায়নেও যথার্থ সৌমিত্রকাকা।

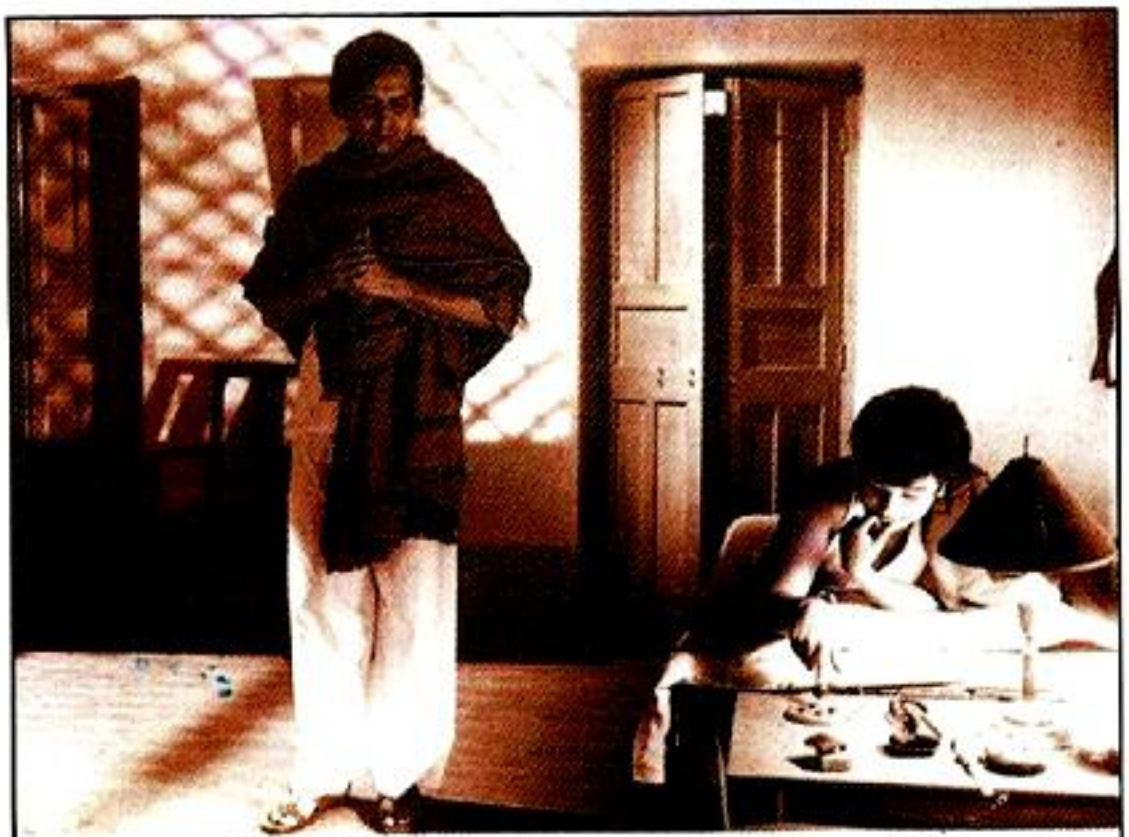

বাঙালিয়ানায় অদ্বিতীয়। কিন্তু এই প্রজন্মের পছন্দের ফেলুর মধ্যে যতটা 'টাফনেস' থাকা দরকার, ততটা সৌমিত্রকাকার মধ্যে ছিল কি?

কারিগরি প্রকৌশল 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে' ছবিতে যতটা ব্যবহৃত হয়েছে, তেমনটা ফেলুদার আগের কোনও ছবিতে আসেনি। সেটা সম্ভবও ছিল না অবশ্য।

বোম্বাইয়ের বোম্বেটে ছবিতে ট্রেন আর ঘোড়ার দৌড়ের দৃশ্যের শুটিংয়ের তোড়জোড়। চিত্রগ্রহণের সময়ে সোনার কেল্লা ছবির উট আর ট্রেনের দৌড়ের দৃশ্যটার কথা আমার বারবার মনে পড়ছিল।

মগনলাল মেঘরাজ। উৎপল দত্ত ছাড়া আর কাউকে ভাবা যেত কি?

জটায়ুর চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টায় খামতি ছিল না অনুপকুমারের। কিন্তু ভগ্ন স্বাস্থ্য বড় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

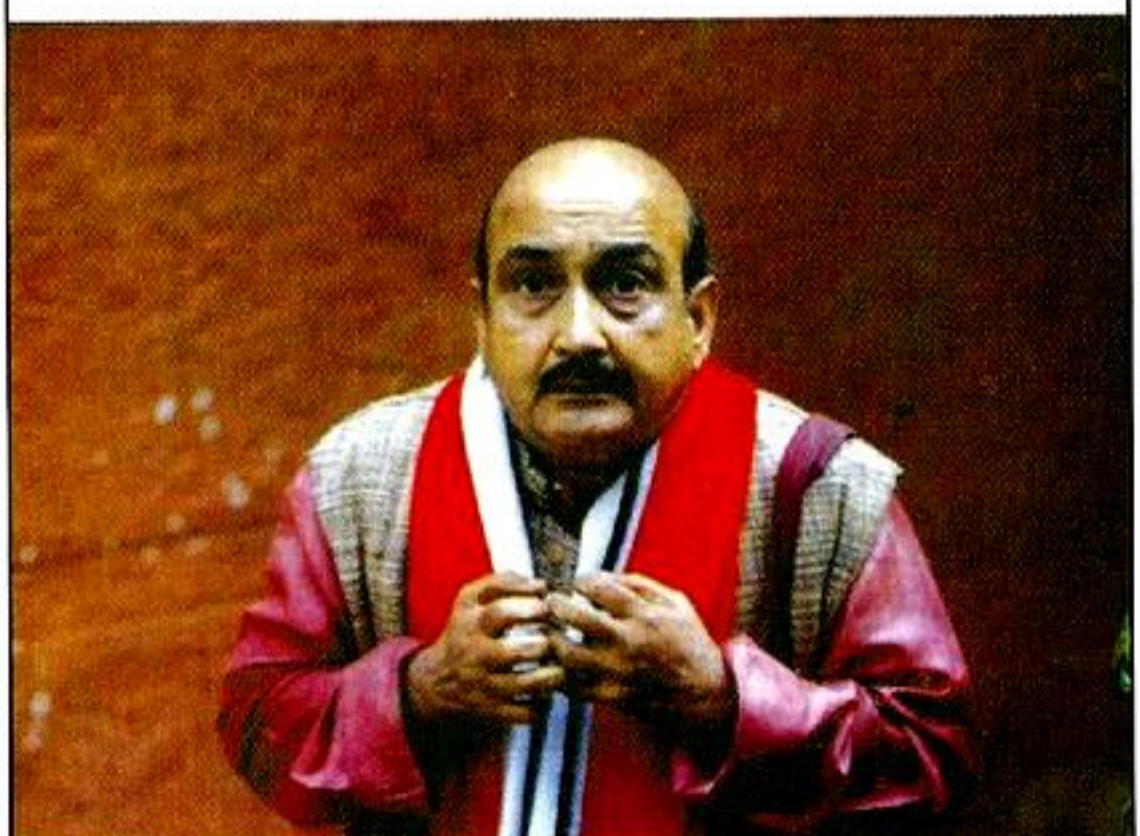

বিভুদার চেহারাটা জটায়ুর চরিত্রে মানানসই।

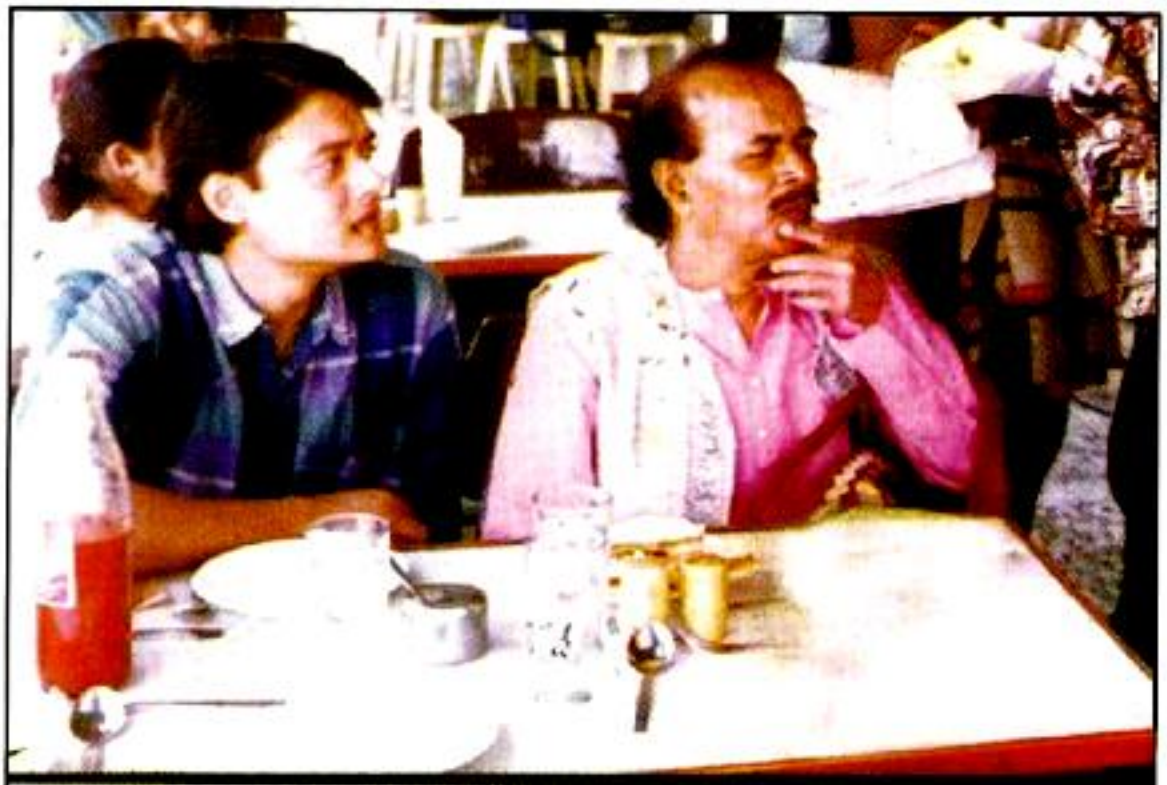

বেঁচে থাকলে রবিকাকাই জটায়ুর ভূমিকায় সন্তোষদার অভাব অনেকটা ভুলিয়ে দিতে পারতেন।

সোনার কেল্লা ছবির সেই বিখ্যাত উট বনাম ট্রেন ছবির দৃশ্য।

কিস্‌সা কাঠমাণ্ডু কা
হিন্দি ফেলু বাংলায় ফেল

আর্থার কনান ডয়েলের অমর গোয়েন্দাচরিত্র শার্লক হোম্‌সকে যে ফেলুদা 'গুরু' বলে মানত, সেটা বাবা একদম সরাসরি 'লন্ডনে ফেলুদা' কাহিনিতে লিখেই দিয়েছেন। লন্ডনে তদন্তে গিয়ে বেকার স্ট্রিটে দাঁড়িয়ে ফেলুদা বলছে, গুরু তুমি ছিলে বলেই আমরা আছি। আজ আমার লন্ডনে আসা সার্থক হল।' ফেলুদার চরিত্রে, তার তদন্তের পদ্ধতিতে শার্লক হোম্‌সের ছাপ যে আছে, সেটা আর নতুন করে বলে দেওয়ার দরকার হয় না। বিশেষ করে শার্লক হোম্‌সের 'অবজার্ভেশনে'র ব্যাপারটা—স্রেফ একটা মানুষের চেহারা দেখে তার সম্বন্ধে খুঁটিনাটি অনেক কিছু বলে দেওয়ার ক্ষমতাটা ফেলুদাও রপ্ত করে দুর্দান্তভাবে। ফেলুদার দ্বিতীয় কাহিনি 'বাদশাহী আংটি' থেকেই বাবা এই 'অবজার্ভেশনের' ব্যাপারটা আনতে শুরু করেন, যদিও প্রথম কাহিনি 'ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি'তে তার কয়েকটা ইঙ্গিত ছিল।

অবজার্ভেশনের ক্ষমতাটা ছাড়াও, শার্লক হোম্‌সের আরও একটা প্রভাব যে ফেলুদার মধ্যে ভীষণভাবে রয়েছে, সেটা আমার প্রায়ই মনে হয়। গোয়েন্দাগিরির পাশাপাশি হোম্‌সের দৈনন্দিন অস্তিত্বটাকেও কনান ডয়েল নিপুণভাবে ফুটিয়েছেন। হোম্‌সের কথা বলার ধরন, পড়াশোনা, খাদ্যাভ্যাস কিংবা তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তা বা একাগ্রতার ছবিটা যেভাবে আঁকা হয়েছে তা এককথায় অনবদ্য। ভিক্টোরিয়ান যুগে ব্রিটিশরা যে মানসিক উৎকর্ষের জায়গাটায় পৌঁছেছিল, হোম্‌স যেন তারই একটা জলজ্যান্ত নিদর্শন। ফেলুদাকেও আমার ঠিক তেমনই মনে হয়। শুধু একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ নয়, ছয় এবং সাতের দশকে শিক্ষিত, শহুরে আধুনিক বাঙালি যুব সমাজের প্রতিনিধি যেন সে। আর তার কাহিনিগুলোও যেন আধুনিক বাঙালি জীবনের একটা বিশেষ সময়ের প্রতিচ্ছবি। বাবা যে তাঁর নিজের চরিত্র, রুচি, অভ্যেস এবং নানা গুণের অনেকটাই গোয়েন্দাকে ধার দিয়েছিলেন, সেটা এখন অনেকেই জানেন। এখানে বলব, ফেলুদাকে নিয়ে আমার প্রথম ছবিতে তার

বাঙালিয়ানার ব্যাপারটা কেন ধরে রাখা যায়নি, এবং তার ফলে আমাদের ঠিক কী পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়েছিল।

ফেলুদাকে নিয়েই আমি আমার প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্যের ছবিটা করব বলে ভেবেছিলাম। সোনার কেল্লা এবং জয় বাবা ফেলুনাথ, বাবার এই দুটো ছবির নির্মাণেই একেবারে গোড়া থেকে আমি ভীষণভাবে জড়িয়ে ছিলাম। ফেলুদার কোনও নতুন গল্প লেখা হলে সেটা আমাকে আর মা'কেই আগে পড়ে শোনাতেন বাবা। আমাদের কোনও অংশে আপত্তি থাকলে সেটা বলতাম। কখনও কখনও বাবা আমাদের পরামর্শ গ্রহণও করতেন। ফেলুদার ছবি দুটো তৈরির সময়েও আমি বাবাকে কিছু কিছু বিষয়ে আমার ভাবনাচিন্তার কথা বলেই থাকতাম। ফেলুদার গল্প ও ছবির এই প্রভাবটার জন্যই বোধহয় নিজের পরিচালক জীবনের শুরুটা তাকে বাদ দিয়ে ভাবতে পারিনি। কিন্তু ইচ্ছেটা শেষ পর্যন্ত আর বাস্তব হয়ে ওঠেনি।

বলা ভালো, প্রথম ছবির বিষয় হিসেবে ফেলুদাকে বাছতে তেমন ভরসা পাচ্ছিলাম না। তার দুটো কারণ। প্রথমত ফেলুদাকে নিয়ে বাবার ছবি দুটো তার আগে ভীষণ সফল হয়েছে। ঠিক এর পরেই যদি আমিও ওই পথে হাঁটি, সে ছবি দর্শকরা কীভাবে গ্রহণ করবেন তা নিয়ে আমার একটা সংশয় ছিলই। নিশ্চিতভাবেই জানতাম, বাবার ফেলুদার সঙ্গে আমার ফেলুদার একটা তুলনা হবে, যেটা এতদিন বাদে 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে' তৈরির পরেও হচ্ছে। সত্যি কথা বলতে, এই তুলনার ব্যাপারটা সব সময়েই একটা ছবির ভবিষ্যতের পক্ষে ক্ষতিকর, একজন উঠতি পরিচালকের পক্ষে তো বটেই।

দ্বিতীয় কারণটা অবশ্যই অভিনেতা সন্তোষ দত্ত-র মৃত্যু। বাবা যে ফেলুদাকে নিয়ে আর কখনও ছবি করেননি, তার একটা প্রধান কারণ ওটাই। এক সাক্ষাৎকারে তিনি সে কথা বলেও ছিলেন। সন্তোষ দত্ত ছাড়া তখন জটায়ু ভাবা যেত না, আর জটায়ু ছাড়া ফেলুদার ছবি অসম্পূর্ণ। সোনার কেল্লা ছবিটা করার পর বাবা তো পরের ফেলুদার গল্পগুলোতে জটায়ুর চেহারাটাই বদলে দিয়েছিলেন। ইলাস্ট্রেশনে জটায়ুর চরিত্রে উঠে আসতেন অনেকটা সন্তোষদা। বাংলা সাহিত্যে এমন নিদর্শন আর কোথাও আছে বলে আমার জানা নেই।

১৯৮৩ সালে আমার প্রথম ছবি 'ফটিকচাঁদ' মুক্তি পায়। এরপর দূরদর্শনের ন্যাশনাল নেটওয়ার্কের জন্য যখন হিন্দিতে দুটো সিরিজ পরিচালনা করার সুযোগ এল, তখন ফের ফেলুদাকে নিয়ে ছবি করার কথা ভাবতে বসলাম। তেরোটা

করে দুটো সিরিজে ছিল মোট ছাব্বিশটা পর্ব। প্রথমটায়, অর্থাৎ 'সত্যজিৎ রায় প্রেজেন্টস'-এ অনেকগুলো ছোট গল্প ছিল, সেখানে ফেলুদাকে জায়গা দেওয়া গেল না। দ্বিতীয় সিরিজটা তৈরি হল পরের বছর '৮৭ সালে, 'সত্যজিৎ রায় প্রেজেন্টস-২'। তাতে ফেলুদার গল্প রাখা হবে বলে প্রথম থেকেই ঠিক করলাম।

দুটো সিরিজেরই চিত্রনাট্য করেছিলেন বাবা। হিন্দিতে সংলাপ লেখার দায়িত্ব নিয়েছিলেন অক্ষয় উপাধ্যায়। তবে গল্প বাছতে গিয়ে বাবার মনে হল, সর্বভারতীয় দর্শকের কাছে ফেলুদার পরিচিতি প্রায় নেই বললেই চলে। বাঙালি পাঠক বা দর্শকের কাছে ফেলুদা যে ঠিক কী, সেটা অতএব তাঁদের নতুন করে বোঝানোর চেষ্টা করে কোনও লাভ নেই। তাঁরা ফেলুদাকে সাধারণ প্রাইভেট ডিটেকটিভ হিসেবেই দেখবেন, এবং চাইবেন একটা জমজমাট পরিবেশে টানটান গল্প। হিমালয়ের পটভূমিকায় 'যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে' গল্পটাকেই তাই বাবার মোটামুটি আদর্শ বলে মনে হল। কলকাতা এবং কাঠমাণ্ডুতে ছবিটার শুটিং করে সিরিজে সেটাকে আটটা পর্বে ভেঙে দেখানো হবে বলে আমরা ঠিক করলাম।

কিন্তু ফেলুদা কে সাজবেন? আমরা চাইছিলাম সৌমিত্রকাকাকেই। কিন্তু দূরদর্শনের পক্ষ থেকে বার বার আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছিল, চরিত্রটা কোনও হিন্দিভাষী নামজাদা অভিনেতাকে দিলে দর্শকরা আরও সহজে তাকে গ্রহণ করতে পারবেন। সিরিজটার মার্কেটিং (বিপণন) করতেও তাঁদের সুবিধা হবে।

অনেকগুলো নাম আমাদের মাথায় এল। হিন্দি ছবির অভিনেতাদের মধ্যে টানটান লম্বা চেহারার অভাব ছিল না, কিন্তু সেই সপ্রতিভ, বুদ্ধিদীপ্ত মুখ আর দুটো উজ্জ্বল চোখ? সমস্ত 'ফিচার্স' মিলিয়ে যাঁকে বাবার একেবারে 'অটোমেটিক চয়েস' বলে মনে হল তিনি অমিতাভ বচ্চন।

'শতরঞ্জ কে খিলাড়ী' ছবিতে নেপথ্য ভাষ্য দেওয়ার সুবাদে বাবার সঙ্গে অমিতাভর খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। ওঁর স্ত্রী জয়াদির সঙ্গে তো বটেই। জয়াদি'র প্রথম অভিনয় বাবার মহানগর ছবিতে। সেই অভিনয় দেখে বাবা তাঁকে যে চিঠি দিয়েছিলেন, সেটা পুণে'র ফিল্ম ইনস্টিটিউটে ভর্তি হওয়ার সময় জয়াদিকে কিছুটা সাহায্য করেছিল বলে আমি শুনেছি। অমিতাভ আমাদের বাড়িতেও এসেছেন। ঠিক হল বাবা অমিতাভকে প্রস্তাবটা দেবেন। কিন্তু তখন অমিতাভর জীবনে একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় চলছে। এলাহাবাদ থেকে কংগ্রেসের হয়ে লোকসভা নির্বাচনে জিতে রাজনীতিতে প্রবেশ করেছেন। নতুন জগতে যথেষ্ট

টালমাটালও রয়েছে। ছবির কাজটা অমিতাভ সেই সময় কিছুটা কমিয়ে দিলেও, সাংসদ হিসেবে ব্যস্ততা ছিলই।

তাছাড়া 'অমিতাভ বচ্চন' নামটাতেই আমার কিছুটা অস্বস্তি হচ্ছিল। সেটাই আমার প্রথম ফেলুদা ছবি এবং হিন্দিতে। তার ওপর ওই মাপের একজন স্টারকে নিয়ে কাঠমাণ্ডুর খোলা জনবহুল রাস্তায় অতখানি শুটিং করা! বাঙালি ইউনিট নিয়ে কাজটা কতটা ভালোভাবে করে উঠতে পারা যাবে, তা নিয়ে আমার সংশয় প্রথম থেকেই ছিল। এখানে 'বাঙালি ইউনিট' বলে অবশ্য আমি কাউকে ছোট করতে চাইছি না। যেটা বলতে চাই সেটা হল, সুপারস্টারদের নিয়ে একটা সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশে খোলা রাস্তায় শুটিং-এর হাজারো ঝক্কি সামলানোর জন্য কিছুটা অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয়, ইউনিটের আকারও অনেক বড় হওয়ার দরকার। আমাদের না ছিল সেই অভিজ্ঞতা, না অত বড় ইউনিট। ভেবে দেখলাম রাস্তার ভিড় সামলাতে সামলাতেই ছবিটার দফারফা হবে। শেষ পর্যন্ত বাবার সঙ্গে আলোচনা করে আমরা অন্য কাউকে নেওয়ার কথা স্থির করলাম।

অথচ তখন টেলিকাস্টের তারিখ এগিয়ে আসছে। গোটা সিরিজের অর্ধেকেরও বেশি অংশ জুড়ে থাকবে 'কিস্‌সা কাঠমাণ্ডু কা'। 'ফেলু'-র অভিনেতা তাড়াতাড়ি না বাছলেই নয়। বেশ কয়েক জনের কথা বিবেচনা করার পর কেউ একজন শশী কাপুরের নামটা বললেন। তালেগোলে শশী কাপুরই হয়ে গেলেন ফেলুদা। জটায়ুর চরিত্রে এলেন মোহন আগাসে, আর তোপসের ভূমিকায় অলংকার।

একটা পুরনো প্রশ্নের মুখোমুখি আমাকে আজও হতে হয়। কেন শশী কাপুর? ছবিটা টিভিতে দেখানো শুরু হওয়ার পর স্রেফ এই প্রশ্নটার উত্তর দিতে দিতেই আমরা ক্লান্ত হয়ে গেছি। শশীর মুখ বা অভিনয় ফেলুদার সঙ্গে মোটামুটি মানানসই হলেও, যেটা একেবারেই বেমানান ছিল, সেটা তার স্থূল চেহারা। সত্যি কথা বলতে, সত্তরের দশকের শশীর চেহারাটাই বোধহয় ফেলুদার পক্ষে ঠিকঠাক হত। শশী অবশ্য আমাদের বলেছিল যে শুটিং-এর আগে ওজনটাকে কমানোর চেষ্টা করবে। কিন্তু কলকাতায় প্রথম যেদিন সে ছবির সেট-এ এল, দেখলাম তার চেহারা একটুও কমেনি, এবং আমিও যাকে বলা যায় বেশ মর্মাহত হলাম।

শশী কাপুরের নির্বাচনে আরও কয়েকটি 'ফ্যাক্টর' কাজ করেছিল বলে আমার মনে হয়। শশী বাবার ছবির অত্যন্ত ভক্ত ছিল। জেম্‌স আইভরির 'শেক্সপীয়ারওয়ালা' ছবিটার মিউজিক কম্পোজ করেছিলেন বাবা। ছবিটা রিলিজ করেছিল ১৯৬৬ সালে। ওই ছবিতে একটা প্রধান চরিত্রে ছিল শশী। ছবিটার কাজ চলাকালীন

শশী বাবার ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। 'সোনার কেল্লা' এবং 'জয় বাবা ফেলুনাথ' ছবি দুটো ও আগেই দেখেছিল। কাজেই 'ফেলুদা'র সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণাটা শশীর আগে থেকেই ছিল। সেটা 'কিস্‌সা কাঠমাণ্ডু কা'র শুটিং চলাকালীন আমিও বুঝেছি।

তাছাড়া মুম্বইয়ের কাপুর পরিবারের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ইতিহাসটাও বেশ দীর্ঘ। এর সূচনাটা বোধহয় সেই 'পথের পাঁচালী' ছবির সময় থেকে। গায়ক কিশোরকুমারের মুখ থেকে একটা গল্প শুনেছিলাম। পথের পাঁচালী যখন মুক্তি পায়, মুম্বইয়ের মেহবুব স্টুডিওতে রাজ কাপুরের একটা ছবির শুটিং হচ্ছিল। সেই সময় কিশোরকুমার একদিন দেখেছিলেন, রাজ কাপুর তাঁর ইউনিটের সবাইকে নিয়ে মেহবুব স্টুডিওর একটা ফ্লোরের বাইরের মাঠে খুব গম্ভীর মুখ করে বসে রয়েছেন। কাজকর্ম বন্ধ। ব্যাপারটা কী? রাজ কাপুর নাকি সেদিন পথের পাঁচালী দেখে এসেছিলেন। এবং আপ্লুত হয়ে কিশোরকুমারকে বলেছিলেন, 'ফিল্ম জগতে প্রায় অপরিচিত একজন বাঙালি আমাদের মতো পরিচালকদের বুদ্ধু বানিয়ে ছাড়ল। বড় একটা শিক্ষাও দিয়ে গেল।'

এরপর রাজ কাপুরের সঙ্গে বাবার যোগাযোগ হয়েছে, এবং প্রায় গোটা কাপুর পরিবারই বাবার গুণগ্রাহী হয়ে উঠেছে। রাজ কাপুরের বাবা পৃথ্বীরাজ কাপুর তো আমাদের বাড়িতেও এসেছেন। আর একটা ঘটনাও বলা দরকার বলে আমি মনে করি। দার্জিলিং-এ বাবা যখন 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' ছবির শুটিং করছেন, সেই সময় রাজের ভাই অভিনেতা শাম্মী কাপুরও সেখানে এসেছেন একটা হিন্দি ছবির কাজে। এখন, বাংলা ছবিতে চিরকালই টাকাপয়সা নিয়ে একটা টানাটানি থাকে। শুটিং চলাকালীন কাঞ্চনজঙ্ঘা ইউনিটে ছবি তোলার ফিল্ম-রোলে টান পড়ল। কাঞ্চনজঙ্ঘা আবার রঙিন ছবি এবং রঙিন ফিল্ম বা 'কালার র-স্টক' তখনকার দিনে অত্যন্ত দুর্মূল্য। বাবা বেশ বিপদে পড়লেন। শেষে কোনও উপায় না দেখে তিনি শাম্মীর কাছে গিয়ে অনুরোধ করলেন, 'তুমি দুটো রোল যদি আমাদের ধার দাও, তবে আপাতত সমস্যা মেটে। আমি কলকাতায় ফিরে ওগুলো তোমায় ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করব।' শাম্মী উত্তর দিয়েছিলেন, 'আপনার মতো একজন মানুষ আমাকে সমস্যার কথা বলতে এসেছেন, এটাই আমার কাছে অনেক। আপনি যতগুলো খুশি রোল নিয়ে যান। ওগুলো আপনাকে আর ফেরত দিতে হবে না।' বাবা অবশ্য কলকাতায় ফিরে শাম্মীকে রোল ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিলেন।

হিন্দিতে কাজ করতে গিয়ে কাপুর পরিবারের সঙ্গে এই নিবিড় সম্পর্কটা আমাকে শশীর সঙ্গে 'কমিউনিকেট' করতে সাহায্য করবে—বাবা হয়তো এমনটাই ভেবেছিলেন। তাছাড়া একমাত্র আমাদের কাজ বলেই কিন্তু শশী নিজের সমস্ত ব্যস্ততা ফেলে একটানা ডেট দিয়েছিল। শশী সেটে আসত একদম ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে। পেশাদারিত্ব ছিল দেখার মতো। অভিনয়ের বাইরেও খুঁটিনাটি ব্যাপারে সাংঘাতিক নজর। কতবার শট দেওয়ার আগে মনে করিয়ে দিয়েছে, আগের শটে জামার একটা বোতাম খোলা ছিল, অথবা চুলটা ছিল একটু অন্যরকম.....ইত্যাদি। ক্যামেরার অবস্থান বুঝে শট দেওয়া, কিংবা আলোর এক্সপোজারের বিষয়ে দুর্দান্ত জ্ঞান। আর ফেলুদার 'ম্যানারিজম'গুলো ভালো করে বোঝার জন্য বাবাকে বারবার প্রশ্ন করত। তখনও ফেলুদার গল্পের হিন্দি বা ইংরেজি অনুবাদগুলো বেরোয়নি। বেরোলে, আমার বিশ্বাস সেগুলো শশীকে অনেকটাই সুবিধা করে দিত।

পুরো ছবিটাই আমরা তুলেছিলাম ৩৫ মিলিমিটার সেলুলয়েড। তারপর সেটাকে ভিডিও ফরম্যাটে আনা হয়েছিল। এতে রঙিন ছবির গভীরতাটা ভালো পাওয়া যায়, সরাসরি ভিডিওতে তুললে যা একেবারেই সম্ভব নয়। ছবির প্রসেসিং-এর কাজ হয়েছিল মাদ্রাজের (এখন চেন্নাই) জেমিনি ল্যাবে। ল্যাব থেকে রাতে কাজ সেরে ফেরার সময় একটা টিভির দোকানের সামনে প্রায়ই দাঁড়াতাম আমরা কয়েকজন। কারণ তখন ছবিটার টেলিকাস্ট শুরু হয়ে গেছে। দোকানের ভিতর টিভি চলত, কাচের দেওয়ালের বাইরে দাঁড়িয়ে আমরা দেখতাম। মনে আছে, দোকানের লোকজনও খুব আগ্রহ নিয়ে সিরিজটা দেখতেন।

দুটো সিরিজই দিল্লি আর মুম্বইয়ে প্রচণ্ড জনপ্রিয় হয়েছিল। তবে বাংলায় 'কিস্‌সা কাঠমাণ্ডু কা' আর দর্শকদের মধ্যে একমাত্র অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল শশী কাপুরের চেহারাটা। তাছাড়া ফেলু জটায়ু এবং তোপসে—এই তিন চরিত্রের নিজেদের মধ্যে কথাবার্তায় যে পরিমিত 'হিউমার' বাবা সাহিত্য এবং চলচ্চিত্র দু'জায়গাতেই এনেছেন, সেটা হিন্দি চিত্রনাট্যে বজায় রাখা একেবারেই সম্ভব হয়নি। তিন মূর্তির যে বিশেষ ভাবমূর্তির সঙ্গে বাংলার দর্শক এর আগের দু'টি ছবির সুবাদে অত্যন্ত পরিচিত ছিলেন, সেটা তাই জোর ধাক্কা খেয়েছিল। আটটা পর্বে ছবিটাকে ভাগ করে দেখানোর ফলে দর্শকদের অবিচ্ছিন্ন মনোযোগও পাওয়া যায়নি। কাজেই 'হিন্দি ফেলু'কে এখানে বেশ সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল।

বাবা মোটামুটি ধরাছোঁয়ার বাইরেই থাকতেন, ফেলু-অনুরাগীদের সমস্ত ক্ষোভ

সামাল দিতে হয়েছিল মোটামুটি আমাদেরই। বাবাও ছবিটা দেখে বলেছিলেন, যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা ফেলুদার গল্প পড়ে বড় হয়েছে, তারা কখনওই শশী, মোহন আগাসে এবং অলংকারকে মেনে নেবে না।

বাংলার আসল ফেলুদা-ভক্তদের খুশি করতে না পেরে আমার মনে একটা অস্বস্তি ছিলই। তখন থেকেই ভেবেছি 'যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে' নিয়ে বাংলায় ছবি করব। পরে কলকাতা দূরদর্শনের জন্য সেটা করেওছি।

'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে' মুক্তি পাওয়ার পর একজন আমাকে এই সেদিনও জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিস্‌সা কাঠমাণ্ডু কা'-র সেলুলয়েড প্রিন্টটা পর্দায় দেখানোর বন্দোবস্ত করা যায় কিনা। সত্যি কথাটা হল, টিভিতে ছবিটা দেখানোর পর কলকাতার দর্শকদের প্রতিক্রিয়া দেখে সেটাকে আবার বড় পর্দায় দেখানোর কথা ভাবতেই পারিনি। এবং এখন, বোম্বাইয়ের বোম্বেটে এত সফল হওয়ার পর তো সেই প্রশ্নটাই আর ওঠে না।

বাক্স রহস্য

টাফ্ ফেলুর পয়লা টক্কর

মিশরের দেবতা আনুবিসের মূর্তি নিয়ে বাবা ফেলুদার যে রহস্য-উপন্যাস লিখেছিলেন, তার নাম 'শেয়াল দেবতা রহস্য'। অবশ্য উপন্যাসটার জন্য আরও দুটো নাম উনি এর আগে ঠিক করেছিলেন, 'ফেলুদা ও আনুবিস রহস্য' এবং 'আনুবিস রহস্য'। মজার কথা হল, খসড়া খাতার যে পাতায় এই উপন্যাসটা শেষ হচ্ছে তার কয়েক পাতা পরেই উনি আরও একটি ফেলুদা-কাহিনি লেখা শুরু করেছিলেন। সেই কাহিনিতে হরিনাথ চক্রবর্তী নামক প্রায় নিরীহ চেহারার এক ভদ্রলোক ফেলুদাকে একটা অদ্ভুত রহস্য সমাধান করতে অনুরোধ করছেন। অফিসের কাজে দিল্লি গিয়ে ফেরার পথে ভদ্রলোকের অ্যাটাচি কেসের ভেতর একটা সুপুরির কৌটোর মধ্যে কীভাবে যেন একটা ছোট্ট বিরল তিব্বতি যমন্তকের মূর্তি চলে আসে। কী করে এই অদ্ভুত ঘটনা ঘটল, সেটা অবশ্য ফেলুদার আর খুঁজে বার করা হয়নি, কারণ বাবা কাহিনিটাকে আর শেষই করেননি। এটা ১৯৬৯ সালের কথা। এর তিন বছর পরে উনি ফেলুদাকে নিয়ে যে উপন্যাসটা লিখলেন, তার সঙ্গে কিন্তু ওই অসম্পূর্ণ লেখাটার আশ্চর্য মিল। সুপুরির কৌটো ঘিরে রহস্য জমে উঠেছে সেখানেও, তবে তার ভেতরে আর যমন্তকের মূর্তি নেই, সেটা হয়ে গেছে একটা অত্যন্ত দামি হীরে। ফেলুদার মক্কেলের নামও পালটেছে, দীননাথ লাহিড়ী। আর গোড়া থেকেই এই উপন্যাসটা যে আগের খসড়ার চেয়ে অনেক বেশি জমজমাট, সেটা দু-চার পাতা পড়লেই বোঝা যায়। উপন্যাসের নামটা বলতে হবে? বাক্স রহস্য।

বাবা চলে যাওয়ার পর ফেলুদাকে নিয়ে আমার প্রথম 'এক্সপেরিমেন্ট'। এই বাক্স রহস্যকে ঘিরেই। ছবিটার চিত্রনাট্য এবং পরিচালনা, দুটো দায়িত্বই ছিল আমার। 'বাক্স রহস্য' ভিডিও ফরম্যাটে তোলা হয়েছিল। এবং ওটাই বাংলার প্রথম ভিডিও ছবি, যা সিনেমা হলে প্রদর্শিত হয়েছিল। নন্দনে ছবিটা বহুদিন ধরে চলে। ওখানে ভিডিও প্রোজেকশান সিস্টেম তখন খুব একটা ভালো ছিল

না, আমরা একটা ভালো সিস্টেম ভাড়া করার ব্যবস্থা করেছিলাম। পরে দূরদর্শনেও ছবিটা দেখানো হয়, ফেলুদা-৩০ সিরিজে, বেশ কয়েকটা পর্বে ভাগ করে।

তবে বাক্স রহস্যর আসল গুরুত্বটা ছিল অন্য জায়গায়। 'কিস্‌সা কাঠমাণ্ডু কা'-র ব্যর্থতার পর প্রায় একটা দশক ফেলুদা তখন ছোট, বড় দুই পর্দাতেই অনুপস্থিত। এই সময়টায় আমি বহুবারই ভেবেছি, পর্দায় ফেলুদাকে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। এটাও জানতাম, ফেলুদার এই প্রত্যাবর্তনের কাজটা হবে আমাদের একটা বড়সড় পরীক্ষা। প্রথমত, সোনার কেল্লা এবং জয় বাবা ফেলুনাথ ছবিতে দর্শকদের আকর্ষণ করার যে ক্ষমতা ফেলুদা দেখিয়েছিল, তা এখনও অটুট কিনা, তা এই ছবিতে প্রমাণ হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত, এই প্রথম ফেলুদার ছবিতে চিত্রনাট্য এবং পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার। নিজের পারফরমেন্স নিয়ে তাই চিন্তা একটা ছিলই। এবং তৃতীয়ত, পর্দার ফেলু, তোপসে এবং জটায়ুর অতি পরিচিত চেহারাগুলো বাংলার এই ছবিতেই প্রথম বদলাচ্ছে। কারণ, সিদ্ধার্থকে আর তোপসে মানাবে না, সন্তোষদাও চলে গেছেন, আর সৌমিত্রকাকার বয়সও ফেলুর তুলনায় একটু বেশিই হয়ে গেছে।

বাক্স রহস্য ছবিটা তৈরি হয়েছিল 'ছায়াবাণী'-র ব্যানারে। যার বর্তমান কর্ণধার রামলাল নন্দী। বাংলায় তখনও 'টেলিফিল্মের' চলটা এত বেশি হয়নি। তারপর বাক্স রহস্য আদৌ টেলিভিশনে দেখানো হবে কিনা, সেটাও স্থির ছিল না। এতটা অনিশ্চয়তার মধ্যেও রামলালবাবু যে ছবিটা করতে এগিয়ে এসেছিলেন, তার কারণ একটাই, বাংলার অগুনতি ফেলু ভক্তদের মধ্যে তিনিও একজন।

শ্যুটিং শুরু করার মতো পরিস্থিতি তৈরি হতেই প্রথমে যে প্রশ্নটা আমার মাথায় এল, সেটা হল, এবার ফেলুদা কে সাজবেন? 'জয় বাবা ফেলুনাথ' পর্যন্ত সৌমিত্রকাকাই ঠিক ছিলেন। এর বেশ কয়েক বছর পর অভিনেতা ও নাট্য-পরিচালক বিভাস চক্রবর্তী ফেলুদার গল্প নিয়ে একটা টেলিফিল্ম করেছিলেন। তাতেও সৌমিত্রকাকাই ফেলুদা, এবং তাঁর বয়সটা ওই চরিত্রের পক্ষে অত্যন্ত বেশি দেখিয়েছিল। অর্থাৎ বাক্স রহস্যর জন্য নতুন ফেলু চাই।

কিন্তু আমি জানতাম, এই কথাটা সৌমিত্রকাকাকে আগে থাকতে জানিয়ে না রাখাটা প্রায় অপরাধের পর্যায়ে পড়বে। তবে উনি বরাবরই খুব 'স্পোর্টিং' মেজাজের মানুষ, টেলিফোন করেও বুঝলাম সেই মেজাজটা একেবারেই বদলায়নি। সব কিছু শুনে বেশ মজা করেই বললেন, 'ফেলুদা নয়, ফেলুজ্যাঠা

নামের কোনও ক্যারেকটার হলেই বোধহয় এখন আমাকে বেশি মানাবে।'

এরপর নতুন ফেলু খুঁজতে গিয়ে যার নাম প্রথমেই মনে পড়ল, সে সব্যসাচী চক্রবর্তী। কেন ওর চেহারাটা আগে মনে এল, এই প্রশ্নের পিছনে একটা ঘটনা আছে। সেটা বোধহয় ১৯৯০ সালের শেষের দিকে হবে। বাবা আগন্তুক ছবির জন্য চিত্রনাট্য করেছেন, এমন সময় একদিন বেণু (সব্যসাচীর ডাকনাম) ওঁর সঙ্গে দেখা করতে এল। তখন বাংলায় কয়েকটা সিরিয়াল করে ওর বেশ পরিচিতি হয়েছে। সেদিন ওর সঙ্গে বাবার যে কথাবার্তা হয়েছিল, সেটা উনি আমাকে বলেছিলেন। এখানে সেটা কথোপকথনের ভঙ্গিতেই তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছি, নইলে এই ছোট্ট সাক্ষাৎকারের মজাটা ঠিক পাওয়া যাবে না।

সব্যসাচী সরাসরি জিজ্ঞেস করল, ফেলুদাকে নিয়ে আর ছবি করবেন না?

বাবা উত্তর দিলেন—'না'।

—কেন?

—কারণ সন্তোষ দত্ত নেই। তাকে বাদ দিয়ে ওই তিন চরিত্রের কম্বিনেশনটা জমবে না।

—রবি ঘোষকে দিয়ে জটায়ু হয় না?

—না। রবিকে নিয়ে নয়।

—যদি কম্বিনেশনটা বদলান? মানে ধরুন ফেলুদার ক্যারেকটারটা অন্য কেউ করে?

—কে?

—আমি!!

বাবা তো অবাক। উনি ফের বলেছিলেন, ফেলুদাকে নিয়ে ছবি করার পরিকল্পনা ওঁর আর নেই। তবে উনি বেণুকে আমার সঙ্গে দেখা করতে বললেন। কারণ ফেলুদাকে নিয়ে ছবি করার একটা দীর্ঘকালীন ইচ্ছে যে আমার রয়েছে, সেটা উনি ভালোভাবেই জানতেন।

এরপর বেণুর সঙ্গে আমার কথা হয়, তবে তখনও ওকে সুযোগ দেওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। তারপর থেকে কিন্তু ও নিয়মিত আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। অবশ্য ১৯৯১ সালের শেষের দিক থেকেই বাবার শারীরিক অবস্থার অবনতি নিয়ে আমরা খুব চিন্তিত হয়ে পড়ি। সেই সময়টায়, বাস্তবিকই, নতুন ছবি নিয়ে চিন্তাভাবনা করার মতো অবস্থা ছিল না। তারপর ১৯৯২ সালে তো বাবা চলেই গেলেন।

বাবার মৃত্যুর বছর দুয়েকের মধ্যেই আরও একটা বড় আঘাত আমাদের জন্য অপেক্ষা করেছিল। পথের পাঁচালী সহ বাবার বেশ কিছু ছবির নেগেটিভ এবং মাস্টার পজিটিভ এখানে পড়ে থেকে থেকে সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ব্রিটিশ প্রযোজক ইসমাইল মার্চেন্ট সেগুলোকে লন্ডনে নিয়ে গিয়ে 'রিজুভিনেট' করার একটা ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। 'শেক্সপীয়ারওয়ালা', 'গুরু' ইত্যাদি ছবির প্রযোজক ইসমাইল বাবার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন। আগেই বলেছি, 'শেক্সপীয়ারওয়ালা' ছবিতে সংগীত রচনা করেছিলেন বাবা। কাজেই ইসমাইলের অনুরোধে সম্মত না হওয়ার কোনও কারণ আমি দেখিনি। নেগেটিভগুলো লন্ডনে নিয়ে গিয়ে রাখা হয়েছিল হেন্ডারসন ল্যাবরেটরিতে। কিন্তু সেখানে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে সেগুলো প্রায় নষ্ট হয়ে যায়।

এই খবরে তো আমাদের প্রায় মাথায় হাত দেওয়ার মতো অবস্থা। নেগেটিভ পুড়ে যাওয়ার অর্থ, সেগুলো থেকে আর পজিটিভ প্রিন্ট তৈরি করা যাবে না, এবং ছবিগুলোকে আর কখনওই বড় পর্দায় দেখানো যাবে না। কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের ছবি বলে কথা, বাস্তব যা-ই বলুক, মন থেকে সেটা মেনে নেওয়া কঠিন। আমরা সবাই মিলে একটা রাস্তা বের করার চেষ্টায় ছিলাম।

ইসমাইল মার্চেন্ট নিজেও এই ঘটনায় বেশ আঘাত পেয়েছিলেন। উনি টেলিফোনও করেছিলেন আমাকে। বলেছিলেন, কলকাতায় এবং পুনে ফিল্ম ইনস্টিটিউটের আর্কাইভে থাকা বাবার ছবির পজিটিভ প্রিন্টগুলোকে যাতে ডিজিটাল পদ্ধতিতে মেরামত করা যায়, সে ব্যবস্থা তিনি করবেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত উনি যে এতটা করে ফেলবেন, সেটা আমরা কেউই ভাবতে পারিনি। অনেকটা ইসমাইলের উদ্যোগেই কলকাতায় আসেন খোদ অ্যাকাডেমি অব মোশন পিকচার্স, আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সের রেস্টোরেশন বিভাগের প্রধান মাইকেল ফ্রেন্ড। ভদ্রলোক 'ফিল্ম রিজুভিনেশনের' কাজে একজন বিশেষজ্ঞও বটে।

মাইকেলের আগেই অবশ্য কলকাতায় ঘুরে গেছেন ডেভিড শেফার্ড। তিনিও ছবি পুনরুদ্ধারের কাজে বিশেষজ্ঞ, তবে সাদাকালোয়।. বাবার সাদাকালো ছবিগুলোকে খুঁটিয়ে দেখে তিনি যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন, সেটা খুবই উদ্বেগজনক। মাইকেল ফ্রেন্ড কিন্তু সাদাকালো ও রঙিন, দুটো প্রযুক্তিই ভালো বোঝেন। শেফার্ডের রিপোর্টটা মাইকেল দেখেছিলেন। তারপর তিনি নন্দনে বসে বাবার অধিকাংশ ছবির পজিটিভ প্রিন্ট পরীক্ষা করে দেখেন। শেষে সেগুলিকে লস

অ্যাঞ্জেলিসে অ্যাকাডেমির ল্যাবরেটরিতে নিয়ে যান। এখনও পর্যন্ত অ্যাকাডেমির উদ্যোগেই বাবার অধিকাংশ ক্ষতিগ্রস্ত ছবির প্রিন্ট ও নেগেটিভ পুনরুদ্ধার করা গেছে। এক মহান চলচ্চিত্রকারকে এভাবে সম্মান জানানোর ঘটনা অ্যাকাডেমির নিজের ইতিহাসেও বোধহয় কমই রয়েছে। মাইকেল অবশ্য এই মুহূর্তে আর অ্যাকডেমির সঙ্গে যুক্ত নন।

সেই সময়টায়, বাবার ছবির রিজুভিনেশনের কাজে আমাকে প্রায়ই নন্দনে যেতে হত। আমাদের বিশপ লেফ্রয় রোডের বাড়ি থেকে নন্দন অবশ্য খুব দূরে নয়। এইরকমই একদিন, ওখানে আমার সঙ্গে সব্যসাচীর দেখা হয়ে গেল। দেখলাম ফেলুদার চরিত্রে অভিনয় করার আকাঙ্ক্ষাটা ওর মধ্যে তখনও প্রবল। সেদিনও সব্যসাচী আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, ফেলুদার ছবি কবে হচ্ছে। আমিও প্রতিবারের উত্তরটাই ওকে আর একবার দিয়েছিলাম : 'সময় হলে জানাব'।

এবং সেই সময়টা এসে গেল তার কিছুদিনের মধ্যেই। বাক্সরহস্য করার জন্য এগিয়ে এলেন ছায়াবাণীর রামলাল নন্দী। ছবিটা সব্যসাচী করবে কি না জানতে আমি ওকে খবর পাঠালাম। খবর পেতেই ও আমাকে টেলিফোন করেছিল, 'করব না মানে!'

তবে সব্যসাচীকে নির্বাচিত করার পরেই একটা ছোট প্রশ্ন আমাকে রীতিমতো ভাবিয়ে তুলল। ও চোখে চশমা পরে, বেশ উঁচু পাওয়ারের চশমা। তাহলে ফেলুদা-ও কি চশমা পরবে?

এখন, যুক্তি দিয়ে ফেলুদার চশমা পরা টাকে আটকানোর কোনও রাস্তা নেই। কারণ, ফেলুদার চোখ খারাপ হতেই পারে। তবে, গত ৩০ বছর ধরে ফেলুদার যে চেহারাটা বাঙালি পাঠকদের খুব পরিচিত, তার সঙ্গে কিন্তু চশমা পরা চেহারার কোনও মিল নেই। অনেক ভেবেচিন্তেই তাই বেণুকে চশমা খোলাতে হল। ফেলুদার চোখে চশমা থাকলে ছবিটা হয়তো মার খেত না, কিন্তু নষ্ট হতে পারত তার অতি পরিচিত আইডেনটিটি। আর ঘটনা হল, চশমা খুলে চুলের ধাঁচটা একটু বদলে দিতেই, বেণুকে দিব্যি ফেলুদা বলে মনে হতে লাগল।

আর একটা সমস্যা ছিল সব্যসাচীর চোখ নিয়ে। সাধারণত যাঁরা উঁচু পাওয়ারের চশমা পরেন, তাঁদের চোখদুটো একটু নিষ্প্রভ হয়ে যায়। বেণুরও তাই হয়েছিল। স্ক্রিন টেস্টে টিভির ছোট পর্দাতেও সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছিল। কিন্তু ফেলুদার চোখ তো ঝকঝকে হতেই হবে। শেষ পর্যন্ত বেণুর চোখ দুটো একটু 'হাইলাইট' করে দিতে তখনকার মতো সমস্যা মিটল।

টিভি-র পর্দায় ওইটুকুতেই কাজ চলে গিয়েছিল, কিন্তু সমস্যাটা প্রকট হয় পরে 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে'র শ্যুটিং চলাকালীন। কারণ সেটা বড় পর্দার কাজ। ছোটখাটো ত্রুটিও বিরাট হয়ে ধরা দেয়। সিনেমায় তাই বেণুর চোখের জন্য বিশেষ মেক-আপের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। আর যেটুকু মেক-আপ ঢাকা সম্ভব নয়, সেটুকু বেণু পুষিয়ে দিয়েছিল ওর দুর্দান্ত অভিনয় দিয়ে।

বাক্স রহস্য, বা পরে বোম্বাইয়ের বোম্বেটের চিত্রনাট্য করতে গিয়ে আমার মনে হয়েছিল, গল্পের ক্লাইম্যাক্সে ফেলুর নিজের 'কনট্রিবিউশন'টা কম হয়ে যাচ্ছে। ফেলু যখন বিপদে পড়ছে, সেটার থেকে উদ্ধার পেতে গল্পের অন্য কোনও চরিত্রের অবদান তার থেকে বেশি হয়ে যাচ্ছে। অথচ বাবাই লিখেছেন, ফেলু 'যুযুৎসু'-র প্যাঁচ জানে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তার প্রয়োগ কই?

আসলে বাবা তাঁর গোয়েন্দাকে একজন অত্যন্ত বুদ্ধিমান মানুষ হিসেবেই বেশি দেখাতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ গল্পের ফেলু যতটা 'সেরিব্রাল', ততটা 'টাফ' নয়। আমার কিন্তু বহুদিন ধরেই মনে হত, গল্পে ব্যাপারটা উতরে গেলেও, সিনেমায় বিশেষত আজকের সময়ে, ঠিক জমবে না। সিনেমায় বুদ্ধিমান ফেলুকে কিছুটা শক্তপোক্ত এবং শারীরিক দিক থেকে তৎপরও হতে হবে। নইলে 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে'-র একদম শেষে 'জেট বাহাদুর' ছবির ভিলেন মুম্বইয়ের জাঁদরেল অভিনেতা মিকি ফেলুর অটোগ্রাফ নেবে কেন?

বাক্স রহস্যয় সব্যসাচীকে ফেলুদার সাজে দেখেই কিন্তু আমার মনে হয়েছিল 'টাফ' ফেলুকে পেয়ে গেছি। বেণু ছোট থেকেই দিল্লিতে মানুষ, বাঙালির মজ্জাগত নরমসরম ভাবটা ওর মধ্যে কম। চেহারায় আপাতদৃষ্টিতে একটা কাঠিন্য রয়েছে। তারপর যখন শুনলাম ওর মার্শাল আর্টের-ও ট্রেনিং আছে, তখন বাস্তবিকই বেশ আনন্দ হল। ফেলু সাজার জন্য সব্যসাচীর যে দীর্ঘকালীন 'অ্যাম্বিনেশন'টা ছিল, সেটাই ভিতরে ভিতরে ওকে ওই চরিত্রে অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত করে দিয়েছিল বলে আমার মনে হয়।

একটা জিনিস তো আমাকেও বেশ অবাক করে দিয়েছিল। বাবা গল্পে লিখেছেন, ফেলু বেশ অনেকটা সময় চোখের পাতা না ফেলে থাকতে পারে। বাক্স রহস্যের শ্যুটিং চলাকালীন দেখেছিলাম, শট দেওয়ার সময় দীর্ঘক্ষণ ধরে বেণুর চোখের পলক পড়ছে না। শুধু ফেলু চরিত্রের অভিনয় বলে নয়, চলচ্চিত্রে বা টি ভি তে যাঁরাই অভিনয় করেন, তাঁদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই এই ক্ষমতাটা অত্যন্ত জরুরি। ছবি সম্পাদনার সময়ে বহুবার এমন হয়েছে, শুধু কোনও

অভিনেতা বা অভিনেত্রীর চোখের পলক পড়ে যাওয়ার জন্য একটা শটকে ঠিক জায়গায় কাটতে পারিনি। বেণুর ক্ষেত্রে এই সমস্যাটা কিন্তু কোনওদিন হয়নি। আমার ধারণা, ফেলুদা যে অনেকক্ষণ ধরে চোখের পলক না ফেলে তাকিয়ে থাকতে পারে, এই ব্যাপারটা ও আগে থাকতে জেনে প্রস্তুতি নিয়েছিল। ওর প্রস্তুতি ছিল শারীরিক দিক থেকেও। বোম্বাইয়ের বোম্বেটে করার আগে তো আমি ওকে নিয়মিত ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ করতে বলেছিলাম। আমার কথা যে ও গুরুত্ব দিয়ে শুনেছে, সেটা শুটিং চলাকালীনই বুঝেছি।

বোম্বাইয়ের বোম্বেটে-র অ্যাকশনের দৃশ্যগুলো বেণু কীভাবে উতরে দিয়েছে, তা আর নতুন করে বলার দরকার হয় না। আর এই 'টাফ' ফেলু-র অ্যাকশন দৃশ্যের শুটিং-পর্বও নানান মজাদার ঘটনায় ঠাসা।

* * *

গোঁসাইপুর সরগরম। কলকাতা দূরদর্শনের জন্য ফেলুদা-৩০ ধারাবাহিকে হাত দিয়ে বাবার এই গল্পটাকেই আমরা বেছে নিই। সিরিজে এটা ছিল দ্বিতীয় ছবি। এর আগে যে বাক্স রহস্য দেখানো হয়েছিল সেটা আগের পর্বেই বলেছি। তবে যেহেতু বাক্স রহস্যর শুটিংয়ের সময় দূরদর্শনের সিরিজটার সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক ছিল না, সেহেতু এক অর্থে বলতে গেলে বাংলা দূরদর্শনের জন্য গোঁসাইপুর সরগরম-ই ফেলুদাকে নিয়ে আমার প্রথম টেলি ছবি।

গোঁসাইপুর সরগরম ছবিটার শুটিং করেছিলাম বীরভূম জেলার দুবরাজপুরের কাছে হেতমপুরে। গুপীগাইন বাঘাবাইন ছবিতে যে আমলকি গ্রাম দেখানো হয়েছে তার দৃশ্যায়ন-ও ওখানেই হয়। বাক্স রহস্য থেকেই সব্যসাচীর সঙ্গে আমাদের ইউনিটে নতুন এসেছে শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়। অভিনেতা শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের ছেলে। আর অবশ্যই রবিকাকা, জটায়ুর ভূমিকায়। জটায়ুর চরিত্রে রবিকাকাকে নেওয়ার জন্য সব্যসাচী যে আগেই বাবাকে বলেছিল, সে কথা আগে লিখেছি। বাবা সেই প্রস্তাবে বিশেষ উৎসাহিত বোধ না করলেও, আমি কিন্তু অনেক ভেবেচিন্তে রবিকাকাকেই নিয়েছিলাম। ওঁর চেহারাটা তখন জটায়ু চরিত্রের পক্ষে খুব বেমানান ছিল না। কিন্তু ওঁকে নির্বাচিত করার পিছনে মূল কারণটা ছিল অন্য।

জটায়ুর ভূমিকায় সন্তোষ দত্তর অভিনয় কারওর পক্ষেই ভোলা সম্ভব নয়। কাজেই তাঁর পর এমন একজন কাউকে নির্বাচন করার দরকার ছিল, যিনি অভিনয়ের গুণে চরিত্রটাকে আবার জীবন্ত করে তুলতে পারেন। চেহারার সাদৃশ্য

দেখে যাকে তাকে দিয়ে ওই চরিত্রটায় অভিনয় করালে একেবারেই চলত না। সেই জন্যই রবি ঘোষ, এবং সত্যি কথা বলতে কী, ওই মুহূর্তে অন্য আর কারোর নাম আমার মাথায় আসেওনি। তাছাড়া সিরিজটা হচ্ছে দূরদর্শনের জন্য, যেখানে সপ্তাহে সপ্তাহে এপিসোড জমা দেওয়ার একটা বাধ্যবাধকতা থাকে। তাই নতুন কাউকে নিয়ে জটায়ুর ভূমিকায় 'ট্রায়াল অ্যান্ড এরর' প্রক্রিয়ায় কাজ করানোটা বেশ ঝুঁকির হয়ে যেত। রবিকাকার সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতাটা কিন্তু দুর্দান্ত। তবে সেটা পরে বলা যাবে।

গোঁসাইপুর সরগরম গল্পে যে মল্লিকবাড়ির কথা বাবা লিখেছেন, সেটা একটা পুরনো বড় বাড়ি। প্রায় অট্টালিকাই বলা যায়। সামান্য ভাঙাচোরা, তবে মেরামত করে নেওয়া হয়েছে। হেতমপুরের বিখ্যাত রাজবাড়িটার সঙ্গে গল্পের মল্লিকবাড়ির অনেক মিল পাওয়া যায়। বাড়িটাকে ঘিরে ছিল একটা উঁচু পাঁচিল ভিতরে কিছুটা অযত্নের ছাপওয়ালা একটা বাগান, গল্পেও ঠিক এমনটাই লেখা ছিল।

গোঁসাইপুর সরগরমের ঘটনা এই মল্লিকবাড়িকে কেন্দ্র করেই। প্রায় পুরো ছবিটাই আমরা ওই হেতমপুরে শুটির করেছিলাম। সেই সময়েই সব্যসাচীর দৃঢ় এবং পেশাদার মানসিকতার চেহারাটা আমার সামনে বেশ কয়েকবার ধরা পড়েছিল। এখানে তেমনই একটা ঘটনার কথা বলা যাক।

গোঁসাইপুর সরগরম গল্পটার ভিলেন যদি কাউকে বলতে হয়, তবে সে মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য। একজন ভণ্ড 'থিয়োজফিস্ট'। এই চর্চাটার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি কিছু নেই, তবে ব্যাপারটা ইউরোপে একসময়ে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। তারই প্রভাবে আমাদের এখানেও থিয়োজফি নিয়ে চর্চা শুরু হয়। পরলোক থেকে মৃত ব্যক্তির আত্মা নামানো, অর্থাৎ প্ল্যানচেটের প্রক্রিয়াটাও এই থিয়োজফির মধ্যে পড়ে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও প্ল্যানচেটে আগ্রহী ছিলেন বলে শোনা যায়। বাবা এই চর্চাটাকে ঠিক বিশ্বাস করতেন না। তবে তিনি খুব খোলা মনের মানুষ ছিলেন। থিয়োজফি নিয়ে অনেকদূর পড়াশোনা করেছিলেন। তার প্রমাণ আমরা গোঁসাইপুর সরগরম ছাড়াও তাঁর অন্য কয়েকটি কাহিনিতে পাই।

মৃগাঙ্ক নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য পরলোক চর্চাকে ব্যবহার করেছিল। ফেলুদা এই ভাঁওতাটা ধরতে পেরে যায়। এরপর রহস্য ফাঁস করার জন্য একটা অদ্ভুত পথ ধরে সে। মৃগাঙ্ক যাঁর ক্ষতি করার চেষ্টা করছিল, সেই শ্যামলাল মল্লিকের ছেলে জীবনলালকে নিয়ে একটা নিখুঁত নাটক সাজানো হয়।

মল্লিকবাড়ির সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেকেই একদিন জেনে যান, জীবনলাল খুন

হয়েছেন। এরপর প্ল্যানচেটের আসরে মৃগাঙ্ককে দিয়ে জীবনলালের 'আত্মা' নামানো হয়। আর ওই প্ল্যানচেটের আসরেই ফেলুদা নাটকীয়ভাবে হাজির করে জীবিত জীবনলালকে। প্রমাণ হয়ে যায় মৃগাঙ্ক একজন ঠগ।

এই দুর্দান্ত পরিকল্পনায় একটাই অসুবিধে ছিল। জীবিত মানুষকে মৃতদেহ সাজিয়ে জনসমক্ষে ফেলে রাখা। যেটা প্রায় অসম্ভব একটা কাজ। কাজেই জীবনলালকে সরিয়ে ফেলতে হবে, এবং পুরো কাজটাই এমনভাবে করা দরকার যাতে প্রত্যেকেই মনে করে মৃতদেহ গায়েব হয়ে গেছে, এমনকী তোপসে লালমোহনও। ফেলুদার এই 'মেক বিলিভ' পরিকল্পনার দৃশ্যায়ন ছিল বেশ ঝক্কির। আর অনেকটা দৌড়োদৌড়ির কাজ যে সেখানে আছে, সেটা গল্পটা যাঁরা পড়েছেন তাঁরাই জানেন। আমরা চেষ্টা করেছিলাম, দৃশ্যটাকে যতদূর সম্ভব নিখুঁতভাবে তুলতে।

কিন্তু সমস্যা হল ওই দৃশ্যটার চিত্রগ্রহণের দিনকয়েক আগে। অন্য এক দৃশ্যের কাজ চলাকালীন সব্যসাচীর ডান পায়ের পাতায় একটা বেয়াড়া রকমের ফ্র্যাকচার হয়ে গেল। কোনওভাবে ওর ডান পা-টা একটা দেওয়ালে জোর ধাক্কা খেয়েছিল। তাতেই ফ্র্যাকচার। আমি তো বেশ চিন্তায় পড়ে গেলাম। পায়ে চোট নিয়ে বেণুকে দিয়ে ওই দৃশ্যটার শুটিং আদৌ করা যাবে তো? অথচ ওই দৃশ্যটার ওপরেই গোটা রহস্যভেদের পর্বটা দাঁড়িয়ে আছে, ওটাকে বাদ দেওয়া যাবে না।

আমার সংশয়ের কথা বেণুকে জানালাম। তখনও ও যন্ত্রণায় বেশ কষ্ট পাচ্ছে। সব্যসাচী কিন্তু আমাকে অভয় দিল, 'কোনও ভয় নেই বাবুদা। শুটিং হবে।'

বুঝলাম, স্রেফ মনের জোর থেকে বেণু এই কথাটা বলেছে। তাই উদ্বেগ দূর হল না।

তবে নতুন ফেলু ঠিক কতটা 'টাফ', তার প্রমাণ পেলাম দৃশ্যটার শুটিংয়ের দিনেই। ডান পায়ের পাতা থেকে গোড়ালির ওপর পর্যন্ত ব্যান্ডেজ। যন্ত্রণা যে বেশ রয়েছে, সেটা ওর স্টেপিং দেখেই বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু ক্যামেরার সামনে তা বোঝার উপায় নেই। সাবলীল দৌড়োদৌড়ি। টেক, রিটেক। মসৃণভাবে গোটা ব্যাপারটা উতরে দিল বেণু। দৃশ্যটার যে সমস্ত শট ছবিতে ব্যবহার করা হয়েছিল, সেগুলোতে ওর মুখের চামড়া একবারের জন্যও কুঞ্চিত হতে দেখেনি। অথচ আমি জানি, ওর চোট ঠিক কতটা সাংঘাতিক ছিল।

একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলতেই হয়, নিজের সুবিধে অসুবিধে বা অস্বাচ্ছন্দ্যকে বেণু কখনওই কাজের সময় সামনে আসতে দেয় না। ঠিক যেমন ওর চেহারায়

কখনওই ধরা পড়ে না ওর মানসিক অবস্থা। বাক্স রহস্য ছবিতেই ও প্রথম ফেলু সাজে। জটায়ু হিসেবে রবিকাকারও সেটাই প্রথম ছবি। বাক্স রহস্যের প্রথম দিনের প্রথম শটে রবিকাকার মতো উঁচুদরের অভিনেতাকে দেখেছিলাম কিছুটা নার্ভাস হয়ে পড়তে। অথচ পাশে বসে থাকা বেণুকে দেখে কে বলবে, জীবনের স্বপ্নের চরিত্রে অভিনয় করতে এসে প্রথম শটটা দিতে চলেছে! শান্ত, নিরুদ্বেগ। এখনকার প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা যাকে বলবে 'কুল'!

ফেলুদার চরিত্রে অভিনয় করতে পেরে বেণু কতটা খুশি হয়েছিল, সেটা একটা ছোট্ট ঘটনা থেকেই কিছুটা বোঝা যাবে। বেশ মজার কাণ্ড। ফেলুদাকে নিয়ে বেশ কয়েকটা গল্পের শুটিং তখন হয়ে গেছে। বোধ হয় এই সময়েই একদিন ওর স্ত্রী মিঠু আমাকে ফোন করেছিল, 'বাবুদা', তুমি ফেলুদার ছবি পরপর করে যাও।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন?'

—যতদিন ফেলুদার ছবির শুটিং চলছে, ও বেশ খোশমেজাজে রয়েছে। অন্যসময় বাড়ি ফিরে খিট খিট করে। অল্পতেই রেগে গিয়ে তুলকালাম। কিন্তু এখন যেন সম্পূর্ণ অন্য লোক। সংসারে শান্তি রয়েছে।

একবগ্গা

স্টান্ট মাস্টার

আগেই বলেছি, সব্যসাচীকে দেখেই প্রথম ফেলুদার ছবিতে কিছুটা অ্যাকশন ঢোকানোর পুরনো পরিকল্পনাটা আমি নেড়েচেড়ে দেখি। ফেলুদাকে বড় পর্দায় ফিরিয়ে আনা নিয়েও ওর সঙ্গে আমার বহুবার আলোচনা হয়েছে। 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে' নিয়ে ছবি করার পরিকল্পনা যখন ওকে প্রথম জানাই, বেণু ভীষণ উৎসাহিত হয়ে বলেছিল, 'বয়স থাকতে থাকতে এই ছবিটা করে নিই বাবুদা। নইলে এর পরে হয়তো অ্যাকশনের দৃশ্যগুলো আর জমাতে পারব না।'

বোম্বাইয়ের বোম্বেটে গল্পে মারামারি বলতে আর কে স্টুডিওর ওই 'মক ফাইট'টা। যেখানে স্টান্ট মাস্টার ভিক্টর পেরুমলের সঙ্গে ফেলুদাও কুংফুর 'ডেমনস্ট্রেশন' দেবে। শেষ দৃশ্যটাও অবশ্য টানটান। তবে সিনেমায় আরও কয়েকটি অ্যাকশন দৃশ্য যোগ করা হয়। এবং তাদের চিত্রগ্রহণ পর্বে কয়েকটা চমকপ্রদ গল্পও রয়েছে। ওই মক ফাইটের চিত্রায়ণের গল্পটা এই পর্বে বলব। অবশ্য সেটা বলার আগে একটু পিছিয়ে যাওয়া দরকার।

একটা সময়ে আমি প্রচুর হিন্দি ছবি দেখেছি। আজ থেকে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগেও টেকনিক্যাল দিক থেকে ওরা ছিল রীতিমতো এগিয়ে। গল্প বা চিত্রনাট্য অধিকাংশ ছবিতে গতানুগতিক হলেও, কারিগরি কাজ কিছু কিছু ছবিতে হত বেশ উঁচুমানের। হিন্দি ছবিতে অ্যাকশন দৃশ্যগুলোও আমি খুঁটিয়ে দেখতাম। বেশ কিছু ছবিতে অ্যাকশনের দৃশ্যে ক্যামেরা ও সম্পাদনার কাজ আমায় টেনেছিল। 'শোলে' ছবিটার কথা বলতেই হয়। শোলের টেকনিক্যাল কাজের তারিফ বাবাও করতেন। মুম্বই চলচ্চিত্র জগতের সঙ্গে বাবার সরাসরি যোগাযোগ না থাকলেও, ওখানকার কাজের ধরন বা পরিবেশ সম্বন্ধে অনেক কিছুর খবর রাখতেন। আমার মনে আছে, 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ি' ছবিটার সেটে, শুটিংয়ের অবসরে, বাবা অভিনেতা আমজাদ খান এবং সঞ্জীব কুমারের কাছ থেকে শোলের স্টান্ট নিয়ে অনেক

কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চাইতেন। এর পর তো স্টান্টম্যানদের নিয়ে বাবা একটা দুর্দান্ত উপন্যাসও লিখেছিলেন : মাস্টার অংশুমান।

কিন্তু হিন্দি ছবির মারামারির দৃশ্যগুলোর বিশাল দৈর্ঘ্য আমাকে বেশ পীড়া দিত। কারিগরি কাজ ভালো হওয়া সত্ত্বেও একটা অ্যাকশনের দৃশ্য স্রেফ পরিমিতি বোধের অভাবে মার খেত। এবং আমিও মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে ভাবতাম, যাই, ছবিটার ফাইট ডিরেক্টরের সঙ্গেই এক হাত লড়ে আসি। এই কারণেই, বোম্বাইয়ের বোম্বেটের অ্যাকশন দৃশ্যগুলো নিয়ে আমি খুব সতর্ক ছিলাম। পর্দায় ওগুলো এসেছে অল্প সময়ের জন্য, কিন্তু তাদের গভীরতা হয়েছে সাংঘাতিক। কাঙ্ক্ষিত 'এফেক্ট' আনতে ডিজিটাল ডলবি সাউন্ডও আমাকে খুব সাহায্য করেছে।

অনেকেই জানেন, বেশির ভাগ হিন্দি ছবিতে মারামারির দৃশ্যে ফাইট ডিরেক্টরই শেষ কথা। ওই সব সিকোয়েন্সের শুটিংয়ের সময় পরিচালক মশাই মোটামুটি হাত গুটিয়ে বসে থাকেন। অ্যাকশন দৃশ্য 'কোরিওগ্রাফ' করা, অর্থাৎ শট বাই শট মারামারির অভিনয়টাকে ভাগ করে ফেলার কাজ থেকে ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল পর্যন্ত ফাইট ডিরেক্টরই ঠিক করে দেন।

বোম্বাইয়ের বোম্বেটের মক ফাইটের দৃশ্যেও এমন এক ফাইট মাস্টারের সঙ্গে আমরা কাজ করি, এবং তিনি শুটিং পর্বে আমাদের যথেষ্ট বেগ দিয়েছিলেন। এর একটাই কারণ, আমরা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির ধরাবাঁধা ছকের বাইরে গিয়ে কাজ করতে চেয়েছিলাম।

ছবিতে মক ফাইটের দৃশ্যটা মুম্বইয়ের আর কে স্টুডিওতে ঘটলেও, আসলে ওর শুটিং হয়েছিল অন্ধ্র প্রদেশের রামোজি ফিল্ম সিটির একটা ফ্লোরে। এখন, স্টুডিওয় কুংফুর ডেমনস্ট্রেশনের দৃশ্যটা নিয়ে আমার বহু দিন ধরেই চিন্তা ভাবনা করা ছিল। কুংফুর প্যাঁচকে ক্যামেরায় ঠিকভাবে তুলে আনার জন্য আমি বেশ কিছু বিখ্যাত ইংরেজি অ্যাকশন ছবিও নতুন করে দেখি। ব্রুস লি-র এন্টার দ্য ড্রাগন, রিটার্ন অফ দ্য ড্রাগন ইত্যাদি ছবিগুলোর নাম এই মুহূর্তে মনে আসছে। এইভাবে মোটামুটি একটা প্রস্তুতি নিয়ে আমি দৃশ্যটার শট ডিভিশন করি। কিন্তু শুটিংয়ের দিন ফ্লোরে গিয়ে দেখি, কাজকর্ম ঠিক পরিকল্পনা অনুযায়ী এগোচ্ছে না।

ওই দৃশ্যটার জন্য আমাদের বেশ কয়েক জন ফাইটার দরকার হয়েছিল, যাদের স্টুডিও ফ্লোরে কুংফুর ডেমনস্ট্রেশন দেবে ভিক্টর পেরুমলরূপী রাজেশ শর্মা। ফেলুদা সেখানে গেলে ভিক্টর তাকে ডাকবে। শুরু হবে ভিক্টর ও ফেলুর নকল লড়াই।

ফাইটারদের দল হাজির, ভিক্টর পেরুমল, ফেলু দু'জনেই রেডি, কিন্তু বাধ সাধলেন ফাইট মাস্টার আনন্দ রাজ। ভদ্রলোক দক্ষিণী ছবির নামকরা স্টান্ট বিশারদ।

কুংফু-র প্যাঁচ পয়জারগুলো অভিনেতা ও ফাইটারদের রপ্ত করানোর জন্য তাঁকে ডাকা হয়েছিল। কিন্তু তিনি ঠিক কী ধরনের দৃশ্যের শুটির হতে চলেছে, সেটা না বুঝে অবিকল হিন্দি বা দক্ষিণী ছবির অ্যাকশন দৃশ্যের ধাঁচে একটা লম্বা শট ডিভিশন করে রেখেছিলেন, যেটা মানতে গেলে ওই দৃশ্যের তো বটেই, ছবিটারও সর্বনাশ হয়ে যাবে। অথচ তিনি নিজের পরিকল্পনামাফিক তাঁর শাগরেদদের ট্রেনিং দিয়ে চলেছেন দেখলাম। শুধু দেখলাম না, দেখে শিউরে উঠলাম বলা যায়।

সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ রাজের কাছে গিয়ে দৃশ্যটার জন্য ঠিক কী ধরনের অ্যাকশন প্রয়োজন, সেটা অত্যন্ত বিনীতভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু তিনি বুঝলে তো! উলটে আকারে প্রকারে বলতে চাইলেন, অ্যাকশন দৃশ্যে ছবির পরিচালকের চুপচাপ বসে থাকাই ভালো। ওটাই নাকি নিয়ম।

এরপর আমাদের অনুরোধে ভদ্রলোক তাঁর দীর্ঘ নায়ক বনাম ভিলেন মার্কা মারামারির ছক কিছুটা বদলালেন। কিন্তু সেটা মোটেও যথেষ্ট নয়। অথচ ভদ্রলোককে বেশি ঘাঁটাতে ইচ্ছে করছিল না। দক্ষিণে স্টান্টম্যানদের বিরাট অ্যাসোসিয়েশন আছে। সবাই মিলে একজোট হয়ে শুটিং বন্ধ করে দিলে মাথায় হাত দিতে হবে।

শেষ পর্যন্ত একরকম বাধ্য হয়েই তাঁকে বললাম, 'আমরাও ছোটবেলায় ব্রুস লি-র ছবি বিস্তর দেখেছি। এই নকল মারামারি বোধ হয় সামলে নিতে পারব।' 'দয়া করে শট ডিভিশনের ব্যাপারটা আমাদের ওপর ছেড়ে দিন।

অনুরোধে ভদ্রলোক নিমরাজি হলেন। তবে ভাবখানা এই : কোথাকার কে বাপু বাঙালি তোমরা, কেমন শুটিং করো দেখি একবার!

তবে কুংফুর প্যাঁচ পয়জারগুলো উনি অভিনেতাদের দেখিয়ে দিচ্ছিলেন। আনন্দ রাজের মোটাসোটা চেহারা। অর্থাৎ স্টান্টম্যান বলতেই চোখের সামনে যেমনটা ভেসে ওঠে সেরকম নয়। কিন্তু ওই চেহারাতেই উনি শূন্যে ডিগবাজি খেয়ে কিক্ ছুঁড়ছেন দেখে ভারী আশ্চর্য লাগল।

শুটিং ফ্লোরে বাবার লেখা গল্প অনুসরণে অনেকগুলো মোটা গদি পাতা হয়েছিল। সাধারণত এগুলোর ওপরেই ছবির ফাইটাররা অ্যাকশন দৃশ্যের

অনুশীলন করেন। এখন হায়দরাবাদের ফাইটারদের এই গদির ওপর হাত-পা ছুঁড়তে বিশেষ অসুবিধে হচ্ছিল না। ওঁরা এতে অভ্যস্ত। কিন্তু সমস্যা হচ্ছিল সব্যসাচী আর রাজেশ শর্মার।

প্রথমের দিকে ওরা কিছুতেই পায়ের 'গ্রিপ' পাচ্ছিল না। কয়েকটা শট নিয়ে সমস্যাও দেখা দিল। ওদিকে আবার আনন্দ রাজ সমালোচকের চোখে তাকিয়ে।

কিন্তু সময় কিছুটা গড়াতেই ছবিটা বদলে গেল। বরাবরের মতো এবারেও দৃশ্যটা দুর্দান্তভাবে উতরে দিল সব্যসাচী। গদির ওপর ওর হাত-পা ছোঁড়া দেখে মনে হচ্ছিল বয়সটা বোধ হয় কোনও মন্ত্রবলে বিশ বছর কমে গেছে। সেই সঙ্গে রাজেশেরও জবাব নেই।

দৃশ্যগ্রহণের কাজ যত এগোচ্ছিল, বুঝতে পারছিলাম, আমাদের সম্বন্ধে আনন্দ রাজের ধারণাটা বদলাচ্ছে। শুটিংয়ের মধ্যপর্বে এসে ভদ্রলোককে স্বীকার করতেই হল, 'কাজটা তোমরা দারুণ করেছ। জবাব নেই।'

দৃশ্যগ্রহণের বাকি অংশটায় উনি আমাদের ভীষণ ভাবে সাহায্য করেছিলেন।

জটায়ু'রা

রহস্য রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক লালমোহন গাঙ্গুলী ওরফে জটায়ুর আত্মপ্রকাশ সোনার কেল্লা উপন্যাসে। ১৯৭১ সালে। এর ঠিক এক বছর আগে বাবা পাহাড়ের পটভূমিকায় 'গ্যাংটকে গণ্ডগোল' উপন্যাসটা লেখেন। তাতে জটায়ু নেই ঠিকই, কিন্তু 'রিলিফ ক্যারেক্টর' হিসাবে ফেলু ও তোপসের সঙ্গী হয়েছেন নিশিকান্ত সরকার। এই নিশিকান্ত সরকারের সঙ্গে কিন্তু জটায়ুর অদ্ভুত চারিত্রিক মিল। গ্যাংটকে গণ্ডগোল পড়লে মনে হতেই পারে, জটায়ুর আবির্ভাবের প্রস্তুতি যেন নিশিকান্ত সরকারের মধ্যে দিয়েই নিতে শুরু করেছেন বাবা। ফেলুদার রহস্যভেদের টানটান উত্তেজনার ফাঁকে ফোকরে জটায়ুর নানান মজার কাণ্ডকারখানা পাঠকদের সাময়িক 'রিলিফ' যেমন দিয়েছে, তেমনি তিন চরিত্রের মেলবন্ধনে ফেলুদার কাহিনিগুলোও পূর্ণতা পেয়েছে। আবির্ভাবেই জটায়ুর জনপ্রিয়তা হয়েছিল এমন যে, অনেকে বাবাকে ফোন করে জানতে চাইতেন 'পরের জটায়ুর গল্প কবে বেরোচ্ছে!'

ফেলুদা নিয়ে লেখায় তাই জটায়ুকে দূরে সরিয়ে রাখাটা খুবই অনুচিত হবে। বাবার ইউনিটের অন্যতম সদস্য এবং স্বাধীন পরিচালক হিসেবে এক বিরল অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে। মোট পাঁচজন জটায়ুর সঙ্গে আমি কাজ করেছি। সন্তোষ দত্ত, মোহন আগাসে, রবি ঘোষ, অনুপকুমার এবং বিভু ভট্টাচার্য। এঁদের মধ্যে সন্তোষদা ছাড়া বাকি চারজনই আমার ছবির জটায়ু। এঁদের কথা তো বলবই, তবে সবার আগে সন্তোষ দত্ত, জটায়ু নামটা উচ্চারিত হলেই অবশ্যম্ভাবী ভাবে যাঁর চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। যাঁকে দেখে বাবা ইলাস্ট্রেশনে জটায়ুর চেহারাটা বদলে দেন।

অভিনেতা সন্তোষদার মুনশিয়ানা নিয়ে নতুন করে কিছু বলার নেই। তবে একটা ছোট ঘটনার কথা উল্লেখ না করলে বোঝা যাবে না, শুধু দর্শক নয়, জটায়ু চরিত্রের সঙ্গে সন্তোষদার একাত্মতা সতীর্থ অভিনেতাদের কাছেও কতটা শ্রদ্ধা আদায় করে নিয়েছিল।

এটা উনি চলে যাওয়ার অনেক পরের কথা। বাক্স রহস্য ছবিটা করার আগে জটায়ু চরিত্রে রবিকাকাকে নেওয়ার বিষয়ে মনস্থির করেছি। কথাটা রবিকাকাকে টেলিফোনে জানালাম। ওঁর মতো জাঁদরেল অভিনেতাও আমার প্রস্তাবটা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর গুনে গুনে ঠিক তিনটে শব্দ উচ্চারণ করলেন, এবং তাতেই স্পষ্ট, সন্তোষদার জটায়ুকে উনি ঠিক কী চোখে দেখতেন : 'বাবা! জটায়ু! সন্তোষ দত্ত!'

সোনার কেল্লায় বাবা লিখেছেন জটায়ুর বাড়ি বৈদ্যবাটিতে। তবে পরের কাহিনিতেই সেটা বদলে হল উত্তর কলকাতার গড়পার। এই গড়পারেই ছিল আমাদের আসল বাড়ি। ছেলেবেলায় কয়েকটা বছর গড়পারে কাটিয়ে বাবাকে বকুলবাগানে চলে আসতে হলেও, গড়পারের বাড়ির স্মৃতি তাঁর মনে আজীবন ছিল সজীব। এই গড়পারের বাড়িতেই ছিলেন কুলদারঞ্জন রায়, বাবা যাঁকে ধনদাদু বলে ডাকতেন। ছেলেবেলায় বাবার দেখা অন্যতম বর্ণময় চরিত্র কুলদারঞ্জন। গল্প বলায় আশ্চর্য রকমের দক্ষতা ছিল তাঁর। ছোটদের জন্য ইলিয়ড ও ওডিসি, পুরাণের গল্প, বেতাল পঞ্চবিংশতি ইত্যাদি বেশ কয়েকটা ভালো বইও তিনি লিখেছিলেন। গড়পারের বাড়িতেই ছিল তাঁর স্টুডিও, সেখানে ফটো ফিনিশের কাজ হত, এবং তাতেও ধনদাদুর হাত ছিল দুর্দান্ত। আর ছিলেন বাবার দুই কাকা, সুবিনয় ও সুবিমল রায়। আমার দাদু, সুকুমার রায় পরলোকগত হওয়ার পর কয়েক বছরের জন্য সন্দেশ পত্রিকা চালানোর ভার সুবিনয় রায়ের হাতে গিয়ে পড়ে। তাঁরও লেখার হাত ছিল দুর্দান্ত। আর সুবিমল রায় ভাইপো মানিককে যত রাজ্যের আজগুবি গল্প শোনাতেন। অর্থাৎ গড়পারের বাড়িতে বাবার দেখা চরিত্রদের অনেকেই গল্প বলায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

তাই গল্পলেখক লালমোহন গাঙ্গুলী ওরফে জটায়ুকে বাবা যখন সেই গড়পারেই এনে ফেললেন, তখন মনে হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক যে, ছেলেবেলার উজ্জ্বল স্মৃতিটাই হয়তো তাঁর এই কাজকে প্রভাবিত করে থাকবে। এই ধারণার বাস্তব ভিত্তি কতটা তা এখন আর জানার উপায় নেই। গড়পারে জটায়ুর মতো হাস্যকর কোনও চরিত্রকে দেখার অভিজ্ঞতা হয়েছিল কি না, সেটাও বাবা কোনও দিন স্পষ্ট করে বলেননি। কিন্তু জটায়ু চরিত্রটা যে গড়পারের প্রতি তাঁর একটা 'নস্ট্যালজিক স্যালিউট', সেটা ভেবে নেওয়ার কারণ বোধহয় যথেষ্টই রয়েছে।

ফিরে আসি সন্তোষদার কথায়। উনি যে একজন দক্ষ আইনজীবী ছিলেন, সেটা অনেকেই জানেন। ফৌজদারি মামলা করতেন। পর্দার সন্তোষদার সঙ্গে

আসল সন্তোষদার অনেক মিল ছিল। বেশি কথা বলতেন না, কিন্তু রসবোধ ছিল দুর্দান্ত। আদালতে ওঁর সওয়াল শুনে বিচারপতি তো বটেই, আসামিও নাকি হেসে ফেলতেন।

সেই পরশপাথর ছবি থেকে বাবার সঙ্গে যুক্ত, আমাদের বাড়িতে ওঁর যাতায়াত ছিল খুবই। কোনও ছবির শুটিংয়ের আগে বাবা সমস্ত অভিনেতা অভিনেত্রীদের নিয়ে বসে স্ক্রিপ পড়তেন। সে এক জমজমাট আসর। সোনার কেল্লা ও জয় বাবা ফেলুনাথ ছবি দুটোর শুটিংয়ের আগে এই রকম আসরেই সন্তোষদাকে জটায়ুর চরিত্রটা ভালো করে বোঝানোর জন্য বাবা অভিনয় করে দেখাতেন। সন্তোষদা মন দিয়ে বাবাকে লক্ষ করতেন বলে মনে আছে। সোনার কেল্লা ছবিটার একেবারে পরিকল্পনার স্তর থেকেই আমরা জানতাম, সন্তোষদা জটায়ু হচ্ছেন। চরিত্রটার জন্য মেক আপ হিসেবে ওঁকে শুধু একটা গোঁফ লাগাতে হয়েছিল। বাবা তাঁর ছবির অভিনেতাদের সংলাপ মুখস্থ করতে বারণ করতেন যাতে ক্যামেরার সামনে তাঁদের কথাবার্তা স্বাভাবিক বলে মনে হয়। এই পদ্ধতিতে ভালো অভিনেতাদের 'ইম্প্রোভাইজ' করারও অনেক সুযোগ থাকে। সন্তোষদার ইম্প্রোভাইজেশন ছিল দুর্দান্ত। বহুবার এমন হয়েছে, রিহার্সালে কোনও ডায়লগ যেভাবে বলেছেন, শট দেওয়ার সময় সেটা হয়ে গেছে অন্যরকম। এবং জিনিসটা বাবার পছন্দও হয়েছে।

অভিনেতাদের বাবা এতটা স্বাধীনতা দিতেন বলেই একেবারে শটের আগে পর্যন্ত ডায়ালগে ছোটখাট পরিবর্তন ঘটত। তবে দেখতাম, মাঝেমধ্যে সন্তোষদাকে বলছেন, 'ইম্প্রোভাইজেশনটা একটু বেশি হয়ে গেল সন্তোষ। স্ক্রিপ্ট-এ ফিরে এস।' 'হীরক রাজার দেশে' ছবিটার শুটিং-এর সময় তো উনি সন্তোষদাকে আগে থেকেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন, 'সমস্ত ডায়ালগই ছন্দে লেখা। কাজেই সন্তোষ, এখানে বেশি কেরামতি দেখাতে যেও না।'

সোনার কেল্লা আর জয় বাবা ফেলুনাথ, এই দুটো ছবির শুটিং পর্বের বহু মজার গল্প বাবা 'একেই বলে শুটিং' বইটাতে লিখেছেন। সেগুলোর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছেন সন্তোষদা। সে সব গল্প আর নতুন করে বলার কোনও প্রয়োজন নেই। এখানে বরং অন্য একটা গল্প আমি শোনাব, যেটা বাবা কোথাও লেখেননি। এটাও জয় বাবা ফেলুনাথের শুটিং পর্বেরই ঘটনা, এবং পুরো ব্যাপারটার সঙ্গে জড়িয়ে আছেন সন্তোষদা।

কাশীতে বিশ্বনাথ মন্দির থেকে কিছু দূরে জ্ঞানবাপী। আওরঙ্গজেবের বিখ্যাত

মসজিদ এখানেই। বাবার কাহিনি অনুযায়ী, এখান থেকে একটা গলি ধরে পূর্ব দিকে কিছুটা এগিয়ে ফেলুর দুর্দান্ত প্রতিপক্ষ মগনলাল মেঘরাজের আস্তানা। এক ঝলমলে দুপুরে ফেলু, তোপসে আর জটায়ু হাজির মগনলালের আস্তানায়। মগনলাল ফেলুকে ঘোষালবাড়ির তদন্তের কাজটা ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেবে। বিনিময়ে ফেলুর জন্য মোটা অঙ্কের ঘুষ। কিন্তু ফেলু ঘুষ নিয়ে মামলা ছাড়তে অসম্মত হলে 'আঙ্কল' জটায়ুকে হেনস্থা করবে মগনলাল।

জটায়ুকে নিয়ে মগনলাল যে বরাবরই রসিকতা করতে পছন্দ করে, সেটা বাবা লিখেছেন। এই রসিকতা অধিকাংশ সময়েই অত্যন্ত বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে যায়, এবং তার শুরু এই 'জয় বাবা ফেলুনাথ' উপন্যাসেই। 'ফেলুদা অ্যান্ড কোং'-এর সঙ্গে মগনলালের দ্বিতীয় টক্কর 'যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে' উপন্যাসে। তৃতীয়টা 'গোলাপী মুক্তো রহস্য'য়। সেবার তো মগনলাল জটায়ুকে 'রবীন্দ্রনাথ টেগোরে'র গান গাইয়ে ছেড়েছে।

জয় বাবা ফেলুনাথে ফিরে আসি। ঘুষ নিতে ফেলুদা অসম্মত হলে মগনলাল অর্জুনকে ডাকে। অর্জুন আগে সার্কাসে 'নাইফ থ্রোয়িং'-এর খেলা দেখাত। এবার জটায়ুকে একটা 'ডার্ট বোর্ডে'র মতো নকশাকাটা কাঠের তক্তার সামনে দাঁড় করিয়ে শুরু হয় অর্জুনের ছুরি ছোঁড়ার লোমহর্ষক খেলা।

বাবা ভেবেছিলেন কোনও পেশাদার 'জাগলার'কে দিয়ে অর্জুনের ভূমিকায় অভিনয় করাবেন, যাঁর 'নাইফ থ্রোয়িং'-এর কেরামতিটাও আয়ত্তে আছে। কাঠের তক্তার সামনে জটায়ুকে আদৌ দাঁড় করানো যাবে কিনা, সে বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত তখনও নেওয়া হয়নি। বাবা আসলে জাগলারের দক্ষতাটা যাচাই করে নিতে চাইছিলেন। 'নাইফ থ্রোয়িং'-এর জাগলার যথেষ্ট দড় না হলে সন্তোষদাকে কাঠের বোর্ডের সামনে দাঁড় করানোটা, বলাই বাহুল্য, মারাত্মক ঝুঁকির কাজ হয়ে যেত।

একজন জাগলার এলেন। তাঁকে পরীক্ষা করে দেখা হল। একটা বোর্ডের ওপর যেখানে যেখানে 'টার্গেট' এঁকে দিলেন বাবা, ছুরিগুলো তাদের প্রায় একহাত এদিক ওদিকে গিয়ে বিঁধতে লাগল। কয়েকটা আবার খুলে মাটিতে পড়েও গেল।

নাইফ থ্রোয়িং-এর ছুরি ওজনে বেশ ভারী। নির্দিষ্ট গতিবেগ দিয়ে ছুঁড়লে সেটা যাতে সটান বোর্ডে গিয়ে গেঁথে যেতে পারে, সে জন্যই এই ওজন। ছুরিগুলো যদি একটার পর একটা বোর্ডে গিয়ে গাঁথতে না থাকে, তাহলে খেলার মজা দর্শকরা নিতে পারবেন না। আবার ছুরি সামান্য লক্ষ্যভ্রষ্ট হলেই মহা বিপদ।

BDeBooks.com

তাই ঠিক হল, "দৃশ্যটায় কিছু ট্রিক স্পট" ব্যবহার করা হবে। কিন্তু কয়েকটা শটে তো জটায়ুকে তক্তার সামনে দাঁড় করাতেই হবে। নইলে দর্শকদের কাছে দৃশ্যটা যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠবে না। অথচ জাগলারের লক্ষ্যভেদের যা নমুনা, তাতে ওই একটা দু'টো শটও সন্তোষদার জীবন সংশয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

বাবা বুঝতে পারলেন, ওই জাগলারকে দিয়ে কাজটা করানো যাবে না। অথচ সময়মতো আর কাউকে খুঁজেও পাওয়া গেল না। দৃশ্যটা নিয়ে উনি ভাবনাচিন্তা করতে লাগলেন, তবে সন্তোষদাকে স্ক্রিপ্ট পাঠিয়ে দেওয়া হল। তাতে লেখা আছে, অর্জুনরূপী কামু মুখোপাধ্যায় সন্তোষদার দিকে ছুরি ছুঁড়বেন। দৃশ্যটা কীভাবে তোলা হবে, সে কথা কিন্তু ওতে লেখা ছিল না। বাবা অভিনেতাদের যে স্ক্রিপ্ট পড়তে দিতেন, তাতে কারিগরি খুঁটিনাটি লেখা থাকত না। কাজেই সন্তোষদা যখন দৃশ্যটার কথা পড়লেন, তখন তাঁর হৃৎপিণ্ডটা নিশ্চয়ই একবারের জন্য কেঁপে উঠেছিল।

সন্তোষদা সত্যিই বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। সে কথা উনি ছোটদের একটা পত্রিকায় লিখেও ছিলেন। 'জটায়ুর মৃত্যু প্রতীক্ষা'। তার একটা কপি আমার কাছে আছে, কেউ চাইলে পড়তে দিতে পারি।

১৬মে ১৯৭৮। ইন্দ্রপুরী স্টুডিও। 'জয় বাবা ফেলুনাথ' ছবির ভয়ংকর সেই দৃশ্যের চিত্রগ্রহণ। স্টুডিওর একটা ফ্লোরে তৈরি করা হয়েছে মগনলালের বৈঠকখানা। অর্জুনের ছুরি যেখানে একটার পর একটা গিয়ে বিঁধবে, সেই কাঠের বোর্ড তৈরি। তার ওপর বাবা একটা রাক্ষসের ছবির আউটলাইন করে দিয়েছেন। সেট-শিল্পীরা তার ওপর রং করেছেন। সব মিলিয়ে জমজমাট ব্যাপার।

দৃশ্যগ্রহণ শুরু হল। প্রথমে কামু মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে ছুরি ছোঁড়ার দৃশ্যটা তোলা হল। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। বেশ কয়েকটা শটে জটায়ুও আছেন। তবে সেগুলো ছুরি ছোঁড়ার ঠিক আগের মুহূর্ত পর্যন্ত। ছবিটা যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই বুঝবেন আমি কোন শটগুলোর কথা বলছি। আর, যে শটগুলোয় কামুকাকু ছুরি ছুঁড়ে দিচ্ছেন, সেগুলোয় বলাই বাহুল্য উলটোদিকে জটায়ু নেই।

এরপর সেইসব মোক্ষম শট, যেখানে দেখানো হচ্ছে, সন্তোষদার শরীরের চারপাশে ছুরিগুলো এসে বিঁধে যাচ্ছে।

রাক্ষসের ছবি আঁকা সেই বোর্ডটার সামনে সন্তোষদাকে এনে দাঁড় করানো হল।

আশ্চর্য! একটা ছুরিও কিন্তু ওঁর দিকে লক্ষ করে ছোঁড়া হল না।

বরং সন্তোষদার শরীর থেকে এক ইঞ্চি দেড় ইঞ্চি দূরত্বের ব্যবধানে ছুরিগুলোকে বোর্ডের গায়ে পর পর গেঁথে দেওয়া হল। প্রত্যেকটা ছুরির পিছনে বাঁধা সরু নাইলনের তার, যা ক্যামেরায় ধরা পড়বে না। ক্যামেরার চোখের বাইরে থেকে সেই তারগুলোকে টান টান করে ধরেছিলাম আমি এবং আরও কয়েকজন। এবার ক্যামেরা চালু হল। উলটো গতিতে। যাকে বলে 'রিভার্স মোশন ফটোগ্রাফি'। আমরা একটা নাইলনের তার ধরে হ্যাঁচকা টান দিচ্ছি, এক-একটা করে ছুরি বোর্ড থেকে খুলে ছিটকে বেরিয়ে আসছে, আর সেই দৃশ্য উলটো গতিতে তুলে নিচ্ছে ক্যামেরা। যার অর্থ, এই ছবি যখন প্রোজেক্টরে সাধারণ গতিতে চলবে, তখন দেখা যাবে একের পর এক ছুরি এসে বিদ্যুৎগতিতে সন্তোষদার চারপাশে গেঁথে যাচ্ছে। এইভাবে বেশ কয়েকটা শট নেওয়া হল।

বাবার এই দুর্দান্ত পরিকল্পনা পর্দায় ঠিক কী চেহারা নিয়েছিল সেটা আর নতুন করে বলার দরকার পড়ে না। তবে শুটিং-এর পর একটা 'টেকনিক্যাল' ত্রুটি মনের মধ্যে অস্বস্তি তৈরি করছিল। দেখেছিলাম, নাইলনের তারে টান দিয়ে ছুরিগুলো তুলে আনার পর বোর্ডের ওপর ছোট ছোট দাগ হয়ে যাচ্ছে। ক্যামেরাতেও তা ভালোই ধরা পড়ছিল। এখন, দৃশ্যটা রিভার্স মোশনে তোলা, অর্থাৎ দর্শক দৃশ্যগ্রহণের সময়ের সর্বশেষ মুহূর্তটা সবচেয়ে আগে দেখবেন। কাজেই প্রথম দু'একটা ছুরি বোর্ডে এসে গেঁথে যাওয়ার সময় একটু লক্ষ করলে, অন্যান্য গর্তগুলোও ভালোই বুঝতে পারার কথা। পরে শুটিং-এর রাশ দেখে বুঝলাম ঠিক সেটাই হয়েছে।

তাহলে কি দর্শকরা ফাঁকিটা ধরে ফেলবেন?

বাবাকে দুশ্চিন্তার কথা বললাম। কিন্তু বাবা আমাকে অভয় দিয়ে বললেন, 'ওই দৃশ্যটায় এতটাই টানটান উত্তেজনা থাকবে, ছোট্ট ভুলটা দর্শকের চোখেই পড়বে না।'

সত্যিই কি তাই হবে? সন্দেহ একটু রয়েই গেল। ছবি রিলিজ করল। এবং অবাক হয়ে দেখলাম ছুরির দাগগুলো সত্যিই কারও নজরে এল না। আর সত্যি কথা বলতে, বাবার এই দুর্দান্ত এফেক্টের ফাঁকিটা গত ২৬ বছরেও কেউ ধরতে পারেননি। পারেননি বলেই সেদিনের ঘটনা এমন জমিয়ে লেখার সুযোগ আজ হল।

আসলে একেই বলে আত্মবিশ্বাস। শুটিং-এর পরে যে খুঁতটা আমার চোখে

ধরা পড়েছিল, বাবা সেটাকে হয়তো পরিকল্পনার স্তরেই আন্দাজ করেছিলেন। কিন্তু চলচ্চিত্রের কারিগরি বিষয়ে প্রগাঢ় জ্ঞান এবং দীর্ঘদিন ওতপ্রোতভাবে এই মাধ্যমের সঙ্গে জড়িয়ে থাকার অভিজ্ঞতাতেই উনি বুঝেছিলেন, খুঁতটা মোটেই দর্শকদের চোখে পড়বে না।

আর একটা কথা তো বলাই হয়নি। রিভার্স মোশনে সিনেমার ছবি তুললে, তা দেখার সময় অভিনেতার অভিব্যক্তি উলটো হয়ে যায়। অর্থাৎ, হয়তো কেউ গম্ভীর মুখ থেকে হেসে ফেললেন। রিভার্সে ছবি তুললে মনে হবে হাসি গুটিয়ে গিয়ে মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। ছুরি খেলার দৃশ্যটায় সন্তোষদার অভিব্যক্তি কিন্তু যথাযথই লেগেছিল। আসলে বাবা ওঁকে বলে দিয়েছিলেন তক্তা থেকে প্রতিবার ছুরি খুলে বেরিয়ে আসার সময় উলটো 'রিঅ্যাকশন' দিতে। এটা প্রচণ্ড শক্ত একটা কাজ। কিন্তু ঠিক কতটা নিখুঁতভাবে সন্তোষদা কাজটা করেছিলেন, সেই দৃশ্যটা দেখলেই বোঝা যায়।

অভিনয়ের প্রতি সন্তোষদার 'কমিটমেন্ট' ছিল সাংঘাতিক। ঠিক যেমন 'ডিটেলস'-এর বিস্তর গোঁজামিল সত্ত্বেও লোমহর্ষক সাহিত্য রচনায় জটায়ুর নিষ্ঠা। জবাব নেই। এবং সে কথাটা বাবা জয় বাবা ফেলুনাথ উপন্যাসের একেবারে এই দৃশ্যটাতেই স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছেন। প্রাণ হাতে করে যখন জটায়ু অর্জুনের ছুরির মুখোমুখি হতে চলেছে, তখন তার মুখ থেকে এই কথাটা বেরিয়ে আসে, 'বেঁচে থাকলে....প প-প্লটের আর....চি-হি-হিন্তা নেই।' সিনেমায় অবশ্য এই সংলাপটা ব্যবহার করা হয়নি।

এরপরেও সাহিত্যিক জটায়ুর সম্বন্ধে নাক কোঁচকানো উচিত হবে?

* * *

'গোঁসাইপুর সরগরম' এর সম্পাদনার কাজ হচ্ছিল ছবিটার প্রযোজকের স্টুডিওতে। এর আগে 'বাক্স রহস্য' গল্পটা নিয়ে ছবি করেছি। সম্পূর্ণ নতুন ফেলু, তোপসে আর জটায়ুকে সেই ছবিতে দেখা গিয়েছে। নতুন 'ট্রায়ো'কে নিয়ে এটা দ্বিতীয় ছবি। শুটিং শেষ হয়েছে। ছবিটার সম্পাদনার জন্য ওই প্রযোজকের স্টুডিওতে ক'দিন ধরে যাতায়াত করছিলাম।

সময়টা সম্ভবত দুপুরের দিকে হবে। সব্যসাচী, রবিকাকা এবং শাশ্বতকে নিয়ে একটা বেশ জটিল দৃশ্যের এডিটিং চলছে। এমন সময় ছবিটার প্রযোজক এলেন। প্রোডাকশান সংক্রান্ত কয়েকটি কথাবার্তা হল। এরপর উনি হঠাৎই বললেন,

'শুনেছেন, রবি ঘোষ মারা গেছেন।'

প্রথমে ঠিক বুঝতে পারিনি। এতটাই আকস্মিক, সাধারণ এবং সাবলীলভাবে কথাটা উনি বললেন, বক্তব্যটা আমার মাথার ওপর দিয়েই গেল। তার পরেই যেন একটা বড় ঝটকা। কী বললেন উনি? ঠিক বললেন তো?

নিশ্চিত হওয়ার জন্য এবার আমিই জিজ্ঞেস করলাম, কে মারা গেছেন?

—রবি ঘোষ।

চোখের সামনে যেন অন্ধকার দেখলাম। একটু সামলে ওঠার পরেও মুখে কথা জোগাচ্ছিল না। রবিকাকার সঙ্গে আমাদের গোটা পরিবারের অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক। ওঁর মৃত্যু সংবাদে আমার ভিতর নিজের লোক হারানোর মতো শূন্যতা তৈরি হচ্ছিল। কিন্তু, বলতে দ্বিধা নেই, ওই মুহূর্তেও একটা অত্যন্ত 'প্রোফেশনাল' প্রশ্ন প্রকট হল। এবার জটায়ু কে করবেন? দূরদর্শনের সিরিজ তো দেখানো শুরু হয়ে গেছে।

তখনও এডিট শ্যুটের ভিতরেই সবাই বসে ছিলাম। হঠাৎ ভিডিও মনিটরগুলোর দিকে চোখ পড়ল। চমকে উঠলাম। দুটো মনিটরেই রবিকাকা। আশ্চর্য লাগল! যে মানুষটা আমার সামনে টিভির পরদায় রয়েছেন, কয়েকদিন আগেও যাঁকে সঙ্গে নিয়ে হইহই করে হেতমপুর থেকে 'গোঁসাইপুর সরগরম' ছবিটার শুটিং করে এলাম, সেই রবিকাকাই হঠাৎ নেই। বিশ্বাসই হয় না।

রবিকাকার সঙ্গে আমাদের পরিবারের সম্পর্ক সেই '৬২ সাল থেকে। সে বছরেই 'অভিযান' ছবিটার শুটিং হয়। ছবিটা মুক্তি পায় ওই বছরেই। এরপর ধীরে ধীরে রবিকাকা আমাদের বাড়িরই একজন হয়ে উঠতে থাকেন। আমাদের সঙ্গে এত ওতপ্রোত সম্পর্ক এক সৌমিত্রকাকা ছাড়া আর কারও ছিল বলে আমার মনে হয় না।

বাবা যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন অনেকেই আমাদের বাড়িতে নিয়মিত আসতেন। কেউ পেশার খাতিরে, কেউ বা নিছক সম্পর্কের টানে। কেউ কেউ আবার এই দুটো কারণেই। রবিকাকা পড়তেন এই শেষের গোত্রে। তাঁর উপস্থিতি আমাদের বাড়িতে একটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বাবা চলে যাওয়ার পর কিন্তু অনেকেই আমাদের বাড়িতে আসা যাওয়াটা কমিয়ে দেন। যাঁরা আগে প্রতি সপ্তাহে বাবার বসার ঘরে মুখ দেখিয়ে যেতেন, তাঁরা কদাচিৎ আমাদের কুশল জিজ্ঞাসা করতে আসতেন। এক নম্বর বিশপ লেফ্রয় রোডের সেই জমজমাট পরিবেশ অনেক ফিকে হয়ে এসেছিল।

ব্যতিক্রম কিন্তু রবিকাকা। উনি প্রায় প্রত্যেক সপ্তাহে নিয়ম করে আসতেন। প্রত্যেকের খোঁজ খবর নিতেন। বেশ বুঝতে পারতাম, বাবার অবর্তমানে এটাকে উনি নিজের দায়িত্ব হিসেবে ধরে নিয়েছেন।

আগেকার তুলনায় আমাদের বাড়িটা অনেক চুপচাপ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু রবিকাকা যখনই আসতেন, মুহূর্তের মধ্যেই বাড়ির আবহাওয়াটাই যেন বদলে যেত। আমাদের ফ্ল্যাটটা বাড়ির তিন তলায়। লোকজনের আসা-যাওয়া চলে, তাই ফ্ল্যাটের মূল দরজাটা অনেক সময়েই আধখোলা করে রেখে দেওয়া হয়। রবিকাকা, এখনও স্পষ্ট যেন শুনতে পাই, সিঁড়ি বেয়ে উঠে ওই দরজার বাইরে থেকেই তাঁর সেই মার্কামারা ভঙ্গিতে জোরে ডাক দিতেন, 'কই..বাবু....।'

ব্যাস। প্রায় ম্যাজিকের মতো আমাদের বাইরের বসার ঘরের আবহাওয়ার যেন একটা 'ক্যাটাগরিক্যাল চেঞ্জ' ঘটে যেত।

'অভিযান' ছবিতে ড্রাইভার নরসিং'য়ের শাগরেদ হিসেবে রবিকাকার অভিনয় ভোলার নয়। এই প্রসঙ্গেই আসে ওঁর 'ফিজিক্যাল অ্যাকটিং' এর কথা। বাবাও রবিকাকার এই গুণটা খুব পছন্দ করতেন। আসলে অল্পবয়েসে রবিকাকা রীতিমতো শরীরচর্চা করতেন। ডাম্বেল ভাঁজার অভ্যেস ছিল। তাই শরীর ছিল অত ফিট। তাছাড়া থিয়েটার করতেন। থিয়েটারের ভালো অভিনেতাদের 'ফিজিক্যাল অ্যাক্টিং' ভালোই রপ্ত থাকে।

'বাক্স রহস্যয়' রবিকাকার 'জটায়ু'কে দেখে অনেকেরই বিশেষ পছন্দ হয়নি। আসলে দর্শকদের মনে তখনও গেঁথে ছিলেন সন্তোষ দত্ত। তাই তুলনাটা বারবার এসেছে। তবে রবিকাকা তাঁর নিজের মতো করে অভিনয় করে যাচ্ছিলেন।

আমার ব্যক্তিগত ধারণা, প্রথম ছবিটায় জটায়ু চরিত্রটা আত্মস্থ করতে ওঁর একটু অসুবিধা হয়েছিল। কিন্তু ঠিক পরের ছবিতেই উনি কিন্তু বেশ স্বাভাবিক হয়ে এসেছিলেন। আরও কয়েকটা ছবিতে যদি এই চরিত্রটা করার সুযোগ পেতেন, তাহলে হয়তো জটায়ুর ক্যানভাসে আরও কয়েকটা নতুন রংয়ের প্রলেপ পড়ত। সেটা আর সম্ভব হল না।

'ফেলুদা'র ছবির সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলেও আর একটা বিশেষ ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন বলে মনে করছি। এটা 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' ছবির শুটিংয়ের কিছুদিন আগেকার কথা। তখন আমি অনেক ছোট, স্কুলে পড়ি। পরে বাবার কাছে এই প্রশ্নটা শুনেছিলাম।

গু গা বা বা ছবিটার প্রযোজক পেতে খুবই অসুবিধের মধ্যে পড়তে হয়েছিল

বাবাকে। আসলে তখন পশ্চিমবঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা তুঙ্গে। কোনও প্রযোজকই টাকা লগ্নি করতে ভরসা পাচ্ছিলেন না। তৎকালীন ফিল্ম ফাইনান্স কর্পোরেশন ছবিটার প্রযোজনায় সাহায্য করবে বলে জানিয়েছিল। কিন্তু সে সম্ভাবনাও বাস্তবায়িত হয়নি। অথচ শুটিংয়ের জন্যে তখন বাবা একদম তৈরি।

এর কিছুদিন আগে মুম্বইয়ের এক অভিনেতা তথা প্রযোজকের সঙ্গে বাবার আলাপ হয়েছিল। তিনি বাবার কোনও ছবি 'শর্তহীন' ভাবে প্রযোজনা করতে চান বলে জানিয়েছিলেন। গু গা বা বা তিনি প্রযোজনা করবেন কি না জানতে চেয়ে বাবা সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই উত্তর এসে গেল। ভদ্রলোক ছবিটা প্রযোজনা করতে রাজি। কিন্তু তাঁর ভাই এবং বাবাকে ছবিটার দুই মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করতে দিতে হবে।

অথচ তখন বাঘার চরিত্রে রবিকাকার নির্বাচন হয়ে গেছে। তপেনকাকার গুপী চরিত্রে অভিনয় করাটাও একরকম নিশ্চিত। প্রযোজকের শর্ত মানলে এই দু'জনকে বাদ দিতে হয়।

বাবা ওই প্রযোজকের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন। মুম্বইয়ের অভিনেতাদের গুপী ও বাঘা সাজিয়ে ছবিটার সর্বনাশ তিনি করতে চাননি।

অথচ তখন পশ্চিমবঙ্গের, বিশেষ করে কলকাতার যা পরিস্থিতি, তাতে আবার কবে প্রযোজক পাওয়া যাবে তার স্থিরতা নেই। এই প্রেক্ষিতে ওই প্রযোজকের প্রস্তাব ফেরানোটা একটু শক্ত কাজই ছিল। অন্তত একজন স্বাধীন পরিচালক হিসেবে আমার আজ তাই মনে হয়।

বাবার 'কনফিডেন্স লেভেল' ছিল সাংঘাতিক। যা করবেন বলে মনস্থির করেছিলেন, তার একচুল এধার ওধার হল না। আসলে এর আগে বাবার দুটো ছবিতে অভিনয় করেছেন রবিকাকা। 'অভিযান' ও 'মহাপুরুষ'। ওই দুটো ছবিতে ওঁর পারফরমেন্স বাবাকেও অবাক করেছিল। পরে গু গা বা বা-র চিত্রনাট্য যখন তিনি লিখতে বসেন, তখন বাঘা হিসেবে রবিকাকার নামই সম্ভবত প্রথম থেকে ভেবে রেখেছিলেন। সে জায়গায় মুম্বইয়ের অভিনেতা নেওয়ার কথাটা উনি ভাবতেই পারেননি।

রবিকাকা যখন মারা গেলেন, তখন দূরদর্শনে ফেলুদাকে নিয়ে সিরিজটা যে চলছে, সেটা আগেই বলেছি। আরও কয়েকটা গল্পের তখনও চিত্রায়ন বাকি।

খুব তাড়াতাড়ি নতুন জটায়ু খুঁজে বের করা দরকার। তখন টিভিতে দেখানো হচ্ছে বাক্স রহস্য, এডিটিং চলছে 'গোঁসাইপুর সরগরম'-এর এবং 'শেয়াল দেবতা রহস্য'র শুটিং শেষ হয়েছে। পরিকল্পনা ছিল, 'বাক্স রহস্য'র পর শেয়াল দেবতা রহস্য দেখানোর। কিন্তু রবিকাকার স্মৃতিতে উৎসর্গ করে আমরা 'গোঁসাইপুর সরগরম'কেই এগিয়ে আনলাম। এতে একটা সুবিধাও হল। 'শেয়াল দেবতা রহস্য'য় জটায়ু নেই। অর্থাৎ নতুন জটায়ুকে দেখার আগে দর্শকরা কিছুটা সময় পাচ্ছেন। কোনও চরিত্রে আকস্মিকভাবে অভিনেতার পরিবর্তন হলে মেনে নিতে একটু অসুবিধে তো হয়েই থাকে।

তখনই কেউ একজন আমাকে বিভু ভট্টাচার্যের নামটা বলেছিলেন। কিন্তু তখন আবার উনি গোপাল ভাঁড়ের অভিনয় করছেন টিভিতে। আমার মনে হয়েছিল, বিভুদাকে তখন আমাদের ইউনিটে নিলে গোপাল ভাঁড় হিসেবে ওঁর খ্যাতিটা জটায়ুর ওপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। সেটা একটু অসুবিধাজনক হয়ে দাঁড়াত। তাছাড়া ওই সিরিয়ালটার জন্যেই আমাদের সময় দিতে উনি সমস্যায় পড়তে পারতেন। তবে ওঁর চেহারাটা যে জটায়ুর পক্ষে বেশ মানানসই, সেটা তখনই দেখে নিয়েছিলাম।

এরপর অনেকেই অনুপকুমারের নাম করেছিলেন। আমি একটু ইতস্তত করেছিলাম। কারণ ওঁর চেহারাটা তখন আবার জটায়ুর পক্ষে একেবারেই মানানসই ছিল না। বরং 'সোনার কেল্লা'র আগে বাবা জটায়ুর যে সব ইলাস্ট্রেশন করেছিলেন, সেগুলোর সঙ্গে অনুপদার অল্পবিস্তর মিল ছিল। তবে তখন আর বেশি চিন্তা ভাবনা করার নেই। অনুপকুমারকেই জটায়ুর ভূমিকায় নেওয়া হল। নইলে দূরদর্শনকে পর পর এপিসোডের জোগান দেওয়াটা সম্ভব হত না।

কিন্তু জটায়ুর চরিত্রে অনুপকুমারকে দর্শকদের একেবারেই পছন্দ হল না। আমিও বুঝেছিলাম, উনি যথাসাধ্য চেষ্টা করলেও জটায়ু-সুলভ ব্যাপারটা ঠিক আসছে না। দু-তিনটে বিষয় অনুপকুমারের সামনে প্রতিবন্ধক হিসেবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। প্রথমত, উনি আগে কোনওদিন আমাদের ইউনিটে কাজ করেননি। ধাতস্থ হতে একটু সময় লাগছিল। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগত জীবনে সব্যসাচী এবং শাশ্বতর সঙ্গে রবিকাকার যে দারুণ সম্পর্কটা ছিল, সেটা পর্দায় ফেলু, তোপসে আর জটায়ুর বোঝাপড়াটাকে খোলতাই করতে অনেক সাহায্য করত। অনুপকুমারের ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয়নি। তৃতীয়ত, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, অনুপদার শরীরটা সেই সময়ে অত্যন্ত খারাপ যাচ্ছিল। জটায়ুর চরিত্রে অভিনয়ের যে 'ফিজিক্যাল'

অংশ, সেটা করতে ওঁকে যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছিল।

'বোসপুকুরে খুনখারাপি'র দৃশ্যগ্রহণের সময়েই লক্ষ করেছিলাম, ওঁকে খুব ক্লান্ত লাগছে। বেশি হাঁটাহাঁটি করতে অসুবিধে। মাঝেমধ্যে তো এমন হয়েছে, ক্যামেরা চলছে, অথচ শটের মাঝখানে অনুপদা ঘুমিয়ে পড়েছেন। তখন আবার ওঁকে জাগিয়ে দিয়ে নতুন করে শটটা নিতে হয়েছে।

'ফেলুদা ৩০' সিরিজেই 'যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে' গল্পটা আবার বাংলায় চিত্রায়িত করা হয়। হিন্দিতে এই ছবিটা যে এখানকার দর্শক তেমন পছন্দ করেননি, সেটা আগেই বলেছি। এখানকার দর্শকদের কথা ভেবেই বাংলায় ছবিটা করার আগে আমার অনেক নতুন পরিকল্পনা ছিল। তাদের মধ্যে একটা হল, কাঠমাণ্ডুর আকাশে বিমানের ভেতর ফেলু তোপসে এবং জটায়ুকে নিয়ে একটা মজার দৃশ্যের শুটিং করা। কিন্তু অনুপকুমারের অসুস্থতার জন্যই সেটা বাতিল করতে হয়।

তবে অস্বীকার করার উপায় নেই, জটায়ুর চরিত্রে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন অনুপকুমার। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে বাংলা ছবিতে কমেডিয়ানের কাজ করে করে ওঁর অভিনয়ে কতকগুলো 'টিপিক্যাল' ম্যানারিজম চলে এসেছিল। সেগুলোর থেকে উনি মুক্তি পাচ্ছিলেন না। আর শারীরিক অসুস্থতা তো ক্রমশ ওঁকে নির্জীব করে দিচ্ছিল। সিরিজটা শেষ হওয়ার কিছুদিন পরে তো উনিও চলে গেলেন।

অনুপকুমার মানুষটি কিন্তু বড় ভালো ছিলেন। বড় হৃদয়বান মানুষ। হয়তো জটায়ুর চরিত্রটা পরে উনি আরও ভালোভাবে করতে পারতেন। কিন্তু সে সুযোগ আর পাওয়া গেল না।

অনুপকুমার চলে যাওয়ার পর যখন ফের ফেলুদাকে নিয়ে সিরিজ করার সুযোগ এল, তখন বিভু ভট্টাচার্যর সঙ্গে আবার যোগাযোগ হয়। ওঁকে আমার বাড়িতে আসতে বলি। দেখা করতে এসে বিভুদা বললেন, 'আমি আগে আপনাদের ইউনিটে কাজ করেছি!'

আমি তো অবাক। উনি আমাদের সঙ্গে কাজ করেছেন, অথচ আমি জানি না, এটা কী করে হয়? পরে যা বললেন তাতে বুঝলাম আমার জানার কথাও না। 'অপুর সংসার' ছবিতে তিনি ছিলেন 'মাস্টার বিভু' নামে। অপু বিয়ের পর স্ত্রীকে নিয়ে যে পৌরাণিক ছবিটা দেখতে গেছে, তাতেই এক দৃশ্যে প্রহ্লাদের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন তিনি।

বিভুদার অভিনয় এর আগে আমি তরুণ মজুমদারের সিরিজ 'চিরকুমার সভা'

দেখেছিলাম। ওঁকে সামনাসামনি দেখে, কথা বলে মনে হল জটায়ুর চরিত্রটা করতে পারবেন। অন্তত ওঁকে নিয়ে একটা চেষ্টা করা যায়।

টেলিভিশনে বিভুদার জটায়ু হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর কিছু সমালোচনা হয়। আমি ওঁকে বলেছিলাম, মন খারাপ করবেন না, মানুষের মনে এখনও সন্তোষ দত্ত রয়ে গেছেন, আপনি নিজের মতো অভিনয় করে যান। আর বলেছিলাম ক্যামেরার সামনে স্বাভাবিকত্ব বজায় রাখুন। অভিনয় করছেন বলে যেন মনে না হয়।

'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে' গল্পটা জটায়ু কেন্দ্রিক। ততদিনে ওঁর জটায়ু হিসেবে পরিচিতি হয়েছে। বড়পর্দায় যখন গল্পটা নিয়ে ছবি করার সুযোগ এল, ভাবলাম এবার ওঁকে নিয়ে একটা ঝুঁকি নেওয়া যায়। উনি আমার মুখ রেখেছেন। ছবিটায় ওঁর অভিনয়ের যথেষ্ট প্রশংসা হয়েছে।

একটা কথা ঠিক। জটায়ুর ভূমিকায় আর কেউই সন্তোষ দত্তর উচ্চতায় উঠতে পারেননি। আসলে, পর্দার বাইরের সন্তোষদার হাঁটাচলা কথাবার্তার মধ্যেও কিছু ব্যাপার ছিল একদম 'ইউনিক'। বাবা সেটাকেই পর্দায় দুর্দান্তভাবে জটায়ুর চরিত্রে মিশিয়ে দিয়েছিলেন। শুধু কি এই? 'সোনার কেল্লা'র পরে সমস্ত ফেলু-কাহিনির ইলাস্ট্রেশনে তো বটেই, চরিত্রচিত্রণেও জটায়ুকে তিনি ধীরে ধীরে সন্তোষ দত্তর আদল দিয়েছেন বলে মনে হয়।

একটা কথা তাই বলাই যায়। সোনার কেল্লায় জটায়ুর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন সন্তোষদা, আর 'জয় বাবা ফেলুনাথে' তাঁকে অনেকটা নিজের ভূমিকাতেই অভিনয় করতে হয়েছে। তো, সেই অভিনয় ওঁরই তো সবচেয়ে ভালো করার কথা। তাই নয় কি?

মগনলাল মেঘরাজ!

'দো ঘুলঘুলিতে দো রিভলভার আপনার দিকে তাক করা আছে মিস্টার মিত্তার, কাজেই আপনি আমার কথার উপর কথা বলবেন না। আপনি ঝামেলা না করেন তো এইবার আপনার কোনও ক্ষেতি হোবে না—আপনার আঙ্কেলের ভি হোবে না। কিন্তু এর পরে আপনি যা করবেন, ঘোষালবাড়িতে ইনভেস্টিগেশন যা চালাবেন, সেখানে আপনার সেফটির গ্যারান্টি আমি দিব না। এই কথা সাফ বলে দিলাম আপনাকে।'

শুনলেই যেন গা হিম হয়ে যায়। বলে দেওয়ার দরকার পড়ে না, কথাগুলো বেরিয়েছে ফেলুদার চিরশত্রু মগনলাল মেঘরাজের মুখ থেকে। কাশীর জ্ঞানবাপীতে মগনলালের ডেরায় গিয়ে হাজির ফেলু তোপসে আর জটায়ু। মগনলাল ফেলুকে চাপ দিচ্ছে ঘোষালবাড়ির গণেশমূর্তি চুরির তদন্ত ছেড়ে দেওয়ার জন্য। ফেলু রাজি হচ্ছে না। ফেলুকে ভয় দেখাতে মগনলাল জটায়ুকে নিশানা বানিয়ে নাইফ থ্রোয়িংয়ের খেলা দেখানোর বন্দোবস্ত করেছে। তাতে ফেলু বাধা দিতেই মগনলালের মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে ওই হুমকি। এই সংলাপটা অবশ্য জয় বাবা ফেলুনাথ ছবির চিত্রনাট্য থেকে তুলে দেওয়া। মূল উপন্যাসে ওটা একটু অন্যভাবে এসেছে।

জয় বাবা ফেলুনাথেই ফেলু ও মগনলালের পয়লা নম্বর টক্কর। দ্বিতীয় সংঘাত 'যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে' উপন্যাসে। তৃতীয় এবং শেষবারের মতো 'গোলাপী মুক্তো রহস্য'য়। ফেলুর আর কোনও প্রতিপক্ষ তাকে বার বার এভাবে বিপাকে ফেলেনি। আর মগনলালই যে তার সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ, সেটা ফেলু বার কয়েক স্বীকারও করে নিয়েছে। জয় বাবা ফেলুনাথে যেমন, রহস্য সমাধান করার পর তোপসেকে সে বলছে, 'এই রকম একজন লোকের জন্যই অ্যাদ্দিন অপেক্ষা করছিলাম রে তোপসে। এ সব লোকের সঙ্গে লড়ে জিততে পারলে সেটা বেশ একটা টনিকের কাজ দেয়।'

স্যার আর্থার কনান ডয়েলের অমর গোয়েন্দা চরিত্র শার্লক হোমসের প্রভাব

যে ফেলুর চরিত্রে রয়েছে সেটা আগেই বলেছি। হোমসের বেশ কয়েকটি কাহিনিতে তার একজন সাংঘাতিক শত্রু ঘুরে ফিরে এসেছে। প্রফেসর মরিয়র্টি। শার্লক হোমসও তাঁর অনুচর ওয়াটসনের কাছে বেশ কয়েকবার বলেছিলেন, মরিয়র্টির সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে তাঁর মস্তিষ্ক যে পুষ্টি লাভ করে, সেটা আর অন্য কারও ক্ষেত্রে হয় না। এই মরিয়র্টির সঙ্গে হাতাহাতি করতে করতেই সুইজারল্যান্ডের রাইসেনবাখ জলপ্রপাতের ওপর থেকে হারিয়ে যান হোমস। সে গল্পের নাম 'দ্য ফাইনাল প্রবলেম'। পরে অবশ্য পাঠকদের বিপুল চাহিদায় হোমসকে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হন লেখক।

হোমসের সঙ্গে মরিয়র্টির হাড্ডাহাড্ডিটা পাঠকদের কাছে ঠিক কতটা জনপ্রিয় ছিল, সেটা আজ আর তাই নতুন করে বলার দরকার হয় না। আসলে ভিলেন জবরদস্ত না হলে তো নায়কের কেরামতি দেখানোর তেমন সুযোগ থাকে না। কাহিনি এবং প্রেক্ষিত আলাদা হলেও, চেনা প্রতিপক্ষ যদি বারবার ফিরে আসতে থাকে, তাহলে পাঠকরা ধরেই নেন এবার দারুণ শ্বাসরোধকারী ব্যাপার স্যাপার ঘটতে থাকবে। এইভাবে পাঠকের মনযোগ টানতেও লেখকের বেশ সুবিধা হয়ে যায়। সম্ভবত এই থিয়োরি মেনেই মরিয়র্টি বারবার ফিরেছে কনান ডয়েলের কলমে। ফিরেছে মগনলাল মেঘরাজও, ফেলদার মুখোমুখি হতে।

নামের আদ্যাক্ষর এবং কিছুটা তত্ত্বগত সাদৃশ্য ছাড়া মরিয়র্টি এবং মগনলালের মধ্যে কিন্তু আর বিশেষ সাদৃশ্য নেই। বরং অমিলই বেশি। মরিয়র্টি অত্যন্ত শিক্ষিত, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারি, শার্লক হোমসের জটিল চক্রান্তের জালে জড়াতেই তার আনন্দ। অন্যদিকে মগনলালের শিক্ষাদীক্ষার ব্যাপারে বিশেষ কিছু জানার উপায় নেই। তবে তাকে 'শিক্ষিত' বলার উপায় যে একেবারেই নেই, সেটা স্পষ্ট। চক্রান্তের জাল বুনে নয়, মগনলাল তার শিকার ধরে টাকা এবং পেশিশক্তির প্রভাব খাটিয়ে। কথাবার্তাও তার মরিয়র্টির মতো শাণিত নয়। বরং একটা অসৎ চাতুর্যের ব্যাপার রয়েছে। সে হুমকি দিতে ভালোবাসে। পছন্দ করে ভয়ংকর ধরনের রসিকতা করতে, আর অবধারিতভাবেই সেই রসিকতার পাত্রটি হলেন রহস্য রোমাঞ্চ ঔপন্যাসিক লালমোহন গাঙ্গুলি ওরফে জটায়ু।

এই রসিকতার সূত্র ধরেই মগনলাল ফেলুদার ছবিতে ও গল্পে বেশ কিছুটা কমিক রিলিফ নিয়ে আসে। মগনলাল আর জটায়ু মুখোমুখি হলেই মজার মজার সিচ্যুয়েশন তৈরি হয়। আসলে ভিলেনদের মধ্যে কিছুটা 'কমিক এলিমেন্ট' মেশানোর কাজটা বাবা সোনার কেল্লা ছবি থেকেই করেছেন। তাতে দেখানো

হয়েছে দুই ভিলেন লুডো খেলছে। ঠাণ্ডা মাথায় শয়তানি করলেও, মন্দার বোসের কথাবার্তা শুনেও বেশ হাসি পায়। মগনলালের ক্ষেত্রে এই ব্লেন্ডিংটা একদম নিখুঁত হয়েছে। বাকি ক্রেডিটটা অবশ্যই অভিনেতা উৎপল দত্ত'র।

মগনলালকে এভাবে জীবন্ত করে তোলার কাজটা উৎপলদা ছাড়া আর কেউ করতে পারতেন বলে আমার মনে হয় না। জয় বাবা ফেলুনাথের কাস্টিংয়ের সময় ওই চরিত্রে উৎপলদার কথাই বাবা ভেবে রেখেছিলেন। মগনলাল হিন্দির টানে বাংলা বলে। হিন্দি ভাষাটা যে বাঙালি অভিনেতা খুব ভালো বলেন, একমাত্র তিনিই ওভাবে ভাঙা বাংলায় কথা বলতে পারতেন। উৎপলদার হিন্দি বলায় আশ্চর্য দক্ষতা ছিল। এটা একেবারে নিজে নিজেই উনি রপ্ত করেছিলেন।

অনেকেই জানেন না, ইংরেজির পাশাপাশি উর্দু ভাষাতেও অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন উৎপলদা। তাই কথা হিন্দির মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন পাঞ্জাবী টানকে উনি প্রশ্রয় দিতেন। এক পত্রিকার সাক্ষাৎকারেই উনি বলেছিলেন সে কথা।

উৎপলদার অভিনয় প্রতিভা কিংবা বিভিন্ন ভাষায় তাঁর দক্ষতা নিয়ে অনেক জায়গায় অনেক কথা লেখা হয়েছে। এখানে সে সব আর নতুন করে বলার কোনও অর্থ হয় না। তাই ওঁকে নিয়ে কয়েকটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাই এখানে বলব।

পথের পাঁচালী ছবিটা মুক্তি পায় ১৯৫৫ সালে। ছবিটা কলকাতার এক প্রেক্ষাগৃহে দেখার পরই উৎপলদা বাবাকে একটা চিঠি লেখেন। সম্ভবত তখনও দুজনের মুখোমুখি আলাপ হয়নি। চিঠিটা এখনও আমার কাছে যত্ন করে রাখা আছে।

ইংরেজিতে লেখা ওই চিঠিতে উৎপলদা বলেছেন, 'পথের পাঁচালি' দেখার পর ছবিটার স্মৃতি তাঁর মনকে একদম আচ্ছন্ন করে রাখে যে, উনি দু'রাত ঘুমোতে পারেননি। আরও লিখেছিলেন, ছবিটা বাংলা ছবির জগতে একটা উৎকর্ষের নজির হয়ে রইল। সত্যিকারের চলচ্চিত্র এবং তার ব্যাকরণের সঙ্গেও বাঙালি চলচ্চিত্রপ্রেমীদেরও প্রথম পরিচয় ঘটল।

অথচ এই উৎপলদাই, অনেক পরে, যখন নিজের সবচেয়ে পছন্দের ছবিগুলোর নাম করেছিলেন, সেই তালিকায় পথের পাঁচালি ছিল না। সে জায়গায় এসেছিল 'দেবী'। আরও যে সব ছবির কথা উনি বলেছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য, আইজেনস্টাইনের ইভান দা টেরিব্‌ল, চ্যাপলিনের দ্য গ্রেট ডিক্টেটর এবং মঁসিয়ে ভার্দু, আকিরা কুরোসাওয়ার সেভেন সামুরাই ও হাই অ্যান্ড লো ইত্যাদি।

পরিবর্তিত রাজনৈতিক ও সমাজতাত্ত্বিক চিন্তাভাবনায় হয়তো উনি পথের পাঁচালির চেয়ে দেবীকেই বেশি প্রাসঙ্গিক বলে মনে করেছিলেন।

বামপন্থী রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাস রাখতেন উৎপলদা। থিয়েটারকে উনি সেই মতাদর্শ ছড়িয়ে দেওয়ার হাতিয়ার বলে মনে করতেন। পরে সিনেমাকেও উনি এই মর্যাদাটা দেন। একটা সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, ওঁকে সিনেমায় বহু হাবিজাবি চরিত্রে অভিনয় করতে হয়, কারণ সিনেমা থেকে রোজগারটা ওঁকে থিয়েটারের আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার রসদ জোগায়। থিয়েটারের মাধ্যমে রাজনৈতিক বার্তা ছড়ানোর কাজে ওঁকে বহুবার বহু অসুবিধার মুখোমুখি হতে হয়েছে। তেমন একটা স্মৃতি অস্পষ্টভাবে এখনও রয়ে গিয়েছে আমার মনে।

তখন আমি খুব ছোট। বছর সাত আট বয়স হবে বোধ হয়। মনে আছে, কয়েকটা রাতে আমাদের ফোনটা হঠাৎ বেজে উঠেছিল।

ঘুম থেকে উঠে টেলিফোনে কথা বলেই সেই গভীর রাতে বাইরে যাওয়ার পোশাক পরে তৈরি হতেন বাবা। মা তো বেশ ঘাবড়ে যেতেন। কোথায় যাচ্ছেন, জিজ্ঞেস করলে বাবা ছোট্ট করে যে জবাবটা দিতেন, সেটা হল, 'উৎপলকে আবার পুলিশে ধরেছে। ছাড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে।'

খুব সম্ভবত ওই সময়টাতেই অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল। উৎপলদার প্রথম থিয়েটার 'অঙ্গার'-এর অভিনয়ও সম্ভবত ওই সময়েই শুরু হয়। ওই বয়সে আর উৎপলদাকে পুলিশে ধরার কারণটা বাবাকে জিজ্ঞেস করা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু পরে বড় হয়ে যা শুনেছি, তাতে মনে হয় ওই নাটকের সঙ্গে ওঁর গ্রেপ্তার হওয়ার সম্পর্ক ছিল।

অনেকটা এই সূত্রেই বাবার প্রতি উৎপলদার একটা বিশেষ ক্ষোভের কথা বলা যায়। উৎপলদা চাইতেন, সত্যজিৎ রায়ের মতো শক্তিমান পরিচালক পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়, অথবা সত্তরের দশকের টালমাটাল পরিস্থিতি নিয়ে ছবি করুন। কিন্তু বাবা এই 'পিরিয়ড' ফিল্মের বিষয়ে কোনওদিনই বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না। উনি মনে করতেন, একটা সময়ের পর ছবিগুলো প্রাসঙ্গিকতা হারাতে পারে। এই জন্য কোনও একটা বিশেষ সময়ের ছাপ তিনি ছবিতে রাখার বিরোধী ছিলেন। এবং সেটা এতটাই, অভিনেতাদের পোশাক ডিজাইন করতে গিয়েও সমসাময়িক ফ্যাশনকে অনুসরণ করতেন না। একটা সময়ে কলকাতায় বেলবট্স পরার চল ছিল। ধৃতিমানদা বা অন্য কয়েকজন অভিনেতাকে ওই ধরনের ট্রাউজার্স পরতে দেখেছি। বাবা কিন্তু তাঁর ছবিতে

কোনওদিন এই ধরনের পোশাক দেখান নি।

শেকসপিয়ারের গভীর অনুরাগী ছিলেন উৎপলদা। অনুরাগ না বলে 'কমিটমেন্ট' বলাই ভালো। এই কমিটমেন্টের জন্যই উৎপলদা অভিনয় জীবনের প্রথম দিকটা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। জিওফ্রে এবং জেনিফার কেন্দাল, এই ব্রিটিশ দম্পতি পঞ্চাশের দশকে শেকসপিয়ারের নাটক নিয়ে প্রায় গোটা ভারতবর্ষ ঘুরেছিলেন। বিভিন্ন মিশনারি স্কুল, হিল রিসর্ট, এবং প্রতিষ্ঠানে এঁরা শেকসপিয়ারের নাটকের বিশেষ 'শো' করতেন। ভারতবর্ষে আজ শেকসপিয়ার নিয়ে যেটুকু সচেতনতা, তার অনেকটাই এঁদের কল্যাণে। কেন্দালদের দলে ভিড়েছিলেন উৎপলদাও।

পরে উৎপলদা একটা লেখায় স্বীকার করেছিলেন, শেকসপিয়ার সম্বন্ধে তিনি যেটুকু শিখেছেন, তাঁর সিংহভাগই জিওফ্রে কেন্দালের সৌজন্যে। এখানেই কিন্তু শেষ নয়। শেকসপিয়ারের নাটক নিয়ে কেন্দালদের এই ভারতবর্ষ চষে বেড়ানোর বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে একটা ছবি করেন পরিচালক জেম্‌স আইভরি। আর ছবিটার জন্য সংগীত রচনা করেন বাবা। সিনেমাটার নাম অনেকেই জানেন, 'শেকসপিয়ারওয়ালা'।

জয় বাবা ফেলুনাথ ছবিটা ১৯৭৮ সালে মুক্তি পায়। আর উৎপলদাকে ফের মগনলাল মেঘরাজ সাজিয়ে যখন হিন্দিতে 'কিস্‌সা কাঠমাণ্ডু কা'র শুটিংয়ের জন্য ক্যামেরার সামনে আনলাম, তখন মাঝে আটটা বছর কেটে গিয়েছে। সেটা সম্পূর্ণভাবেই আমার ছবির শুটিং। উৎপলদাকে 'হ্যান্ডল' করার পুরো দায়িত্বটাই আমার, কারণ বাবা দূরদর্শনের ওই টিভি সিরিজের শুটিং চলাকালীন সেটে বিশেষ থাকতেন না।

বেশ টেনশন হত। বাবার সঙ্গে ওঁর আগাগোড়া যে সম্পর্কটা ছিল, সেটা উৎপলদার সঙ্গে 'কমিউনিকেট' করতে প্রাথমিকভাবে আমাকে অনেক সাহায্য করেছিল। কিন্তু অন্য অভিনেতাদের কাছে তখন আমার যে স্বাধীনতাটা ছিল, ওঁর ক্ষেত্রে তা পাওয়ার কোনও প্রশ্নই ছিল না। বড়ই গুরুগম্ভীর মেজাজের মানুষ। কেউ ওঁকে ঘাঁটাতে তেমন সাহস পেত না। আমিও না।

ওঁকে নিয়ে প্রথম দিনের শুটিং হয়েছিল কাঠমাণ্ডুর একটা হোটেলে। প্রথম শটটা দিতে ওঁর কিন্তু একটু অসুবিধা হল। আট বছর আগে উনি যতটা সাবলীল ভাবে মগনলালের চরিত্র অভিনয় করেছিলেন, ঠিক সেই ব্যাপারটা আসছে না। অন্য রকম হয়ে যাচ্ছে।

তখন বেশ ভয়ে ভয়ে ওঁকে বললাম, আপনি জয় বাবা ফেলুনাথের কথা

স্মরণ করুন। উনি গম্ভীর হয়ে বেশ কিছুক্ষণ ভাবলেন। ঠিক পরের শটেই আশ্চর্য কাণ্ড। ক্যামেরার সামনে ফিরে এল অবিকল পুরনো মগনলাল।

অভিনয়ের এই 'লেভেল' বদলে ফেলার কাজটা উনি এতটাই সাবলীলভাবে করতেন, দেখে তাক লেগে যেত। দূরদর্শনের জন্য এর আগের সিরিজ, অর্থাৎ 'সত্যজিৎ রায় প্রেজেন্টস' করতে গিয়েও ওঁর এই ক্ষমতাটা অবাক হয়ে উপলব্ধি করেছিলাম। 'ভুতো' গল্পটাকে নিয়ে ছবির শুটিং। প্রধান অভিনেতা দু'জন। পঙ্কজ কাপুর এবং উৎপলদা। পঙ্কজ প্রায় 'আন্ডার অ্যাক্টিং' করেন। উৎপলদার সঙ্গে ওঁর প্রথম শটের একটা রিহার্সাল হল। সেটা দেখার পর আমি বেশ অস্বস্তিতে পড়লাম। পঙ্কজের পাশে উৎপলদার অভিনয় অত্যন্ত চড়া দাগের বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু উৎপলদাকে সে কথা বলার সাহস আমাদের কারওরই নেই। যা থাকে কপালে ভেবে নিয়ে প্রথম শটটা নিলাম। এবং অবাক কাণ্ড। পঙ্কজের সঙ্গে অদ্ভুতভাবে ব্যালান্স করলেন উৎপলদা। লেভেলটা ঠিক ততটাই নামিয়ে ফেললেন, যাতে পঙ্কজের নিচু মাত্রার অভিনয়ের পাশে ওঁকে বেমানান না লাগে।

আসলে যে চরিত্রটায় অভিনয় করতেন, সেটা নিয়ে ওঁর ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড চিন্তা ভাবনা চলত। কিন্তু সেটা বাইরে থেকে তা একদম বোঝার উপায় থাকত না। শুটিংয়ে প্রচুর বইপত্র নিয়ে আসতেন। বিভিন্ন শটের ফাঁকে ফোকরে সেগুলো পড়তেন। বইগুলো অধিকাংশ সময়েই হত অত্যন্ত জটিল বিষয়ের। মাঝে মাঝে আমি ভাবতাম, এতটা মনযোগ এইসব জটিল বিষয়ে দেওয়ার পরের মুহূর্তে উনি এত সাবলীলভাবে শট দিচ্ছেন কী করে?

'কিসসা কাঠমাণ্ডুকা'র শুটিংয়ের সময় ওঁকে মন দিয়ে স্তানিশ্লভস্কি পড়তে দেখেছি। আবার শট দেওয়ার সময় উনি পুরোপরি মগনলাল মেঘরাজ। এই 'স্যুইচ ওভার'টা এত নিখুঁতভাবে হত, যা কল্পনাই করা যায় না। আজ বলতে বাধা নেই, শুটিংয়ের সময় আমি অনেকবার ভেবেছি, এত ভারী ভারী বই পড়ছেন, ডায়ালগ মনে আছে তো উৎপলদার? বলাই বাহুল্য, আশঙ্কটা প্রতিবারেই ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। থিয়েটারটাই ওঁর প্রথম 'প্যাশন' ছিল, তাই হয়তো ডায়ালগ মুখস্থ রাখাটা এত সহজ ছিল ওঁর কাছে।

শেষ করব উৎপলদাকে নিয়ে একটা মজার ঘটনা লিখে। এটা ওই 'ভুতো' গল্পের চিত্রগ্রহণের সময়ের ঘটনা। টি ভি-তে 'সত্যজিৎ রায় প্রেজেন্টস' দেখানো শুরু হয়েছে। কলকাতায় শুটিং চলছে। উৎপলদাকে নিয়ে কাজ করছি। একদিন সকালে সেটে এসে হঠাৎ শুনলাম, উনি মারা গিয়েছেন।

আমার তো মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। উৎপলদা চলে গেছেন সেটা একটা বিরাট ক্ষতি, কিন্তু সেই মুহূর্তে ওঁকে হারানোর দুঃখকে ছাপিয়ে স্পষ্ট হল একটা অত্যন্ত পেশাদারি প্রশ্ন। ভুতো ছবিটার কী হবে? অর্ধেক শুটিং তো হয়ে গিয়েছে।

খুব সম্ভবত সেদিন উৎপলদার কাজ ছিল না। কিছুক্ষণ পরে আমাদের ইউনিটের কয়েকজন উৎপলদার বাড়িতে দৌড়লেন, শেষ শ্রদ্ধা জানাতে। সঙ্গে সাদা ফুলটুলও নিয়ে গেলেন। এবং সেখানে তাঁদের দরজা খুলে অভ্যর্থনা জানালেন স্বয়ং উৎপলদা।

আসলে উৎপলদার মৃত্যু সংবাদ রটে গিয়েছিল ওই ভুতো গল্পটার চিত্রগ্রহণের সূত্র ধরেই। ওতে একটা দৃশ্যে ছিল, ভেন্ট্রিলোকুইস্ট পঙ্কজ কাপুর খবরের কাগজে তার গুরু উৎপলদার মৃত্যু সংবাদ দেখছে। তারপর সেই খবরটা কেটে তার সংগ্রহে রেখে দিচ্ছে।

গোটা সিরিজেই যিনি হিন্দিতে সংলাপ লিখেছিলেন, সেই অক্ষয় উপাধ্যায়ের সঙ্গে হিন্দি 'সন্মার্গ' কাগজের কয়েকজনের ভালো জানাশোনা ছিল। অক্ষয়ই আমাদের বলেছিলেন, উৎপল দত্তের মৃত্যু সংবাদ ছাপা হয়েছে, এমন হিন্দি খবরের কাগজের একটা পাতার 'ডামি' তিনি সন্মার্গ থেকে আমাদের করিয়ে দেবেন। তাতে শেক আপ নেওয়া উৎপলদার ছবিও থাকবে। এই ডামিটা তৈরির সময়েই হয়েছিল যত গণ্ডগোল। সন্মার্গ অফিসের কেউ হয়তো সেটাকে ওপর ওপর দেখে সত্যি করেই উৎপলদার মৃত্যু সংবাদ ভেবেছিলেন। তাঁর থেকেই খবরটা ছড়িয়ে গিয়েছিল।

কথায় বলে, ভুল মৃত্যু সংবাদ মানুষের আয়ু বাড়ায়। এর পরেও উৎপলদা আরও অনেকদিন বেঁচেছিলেন। বহু ছবিতে অভিনয় করেছেন। বাবার আগন্তুক ছবিতে ওঁর অভিনয় তো কোনওদিন ভোলার নয়।

বোম্বাইয়ের বোম্বেটে
ট্রেনের সঙ্গে ফের দৌড়

প্রায় পঁচিশ বছরের বেশি সময় পর ফেলুদাকে নিয়ে আবার বড়পর্দার ছবি। পঁচিশ বছর মানে একটা গোটা শতাব্দীর প্রায় সিকিভাগ, সময়টা নেহাত কম নয়। ভেবে দেখলাম এর মধ্যে মানুষের জীবন অনেকটাই বদলে গেছে, সিনেমার ভাষাও পালটেছে। কাজেই, গোয়েন্দা ফেলুকে নিয়ে নতুন যে ছবি হবে, তাতে অনেক 'পেস' দরকার। তরতরে গতির সঙ্গে প্রয়োজন সাসপেন্স, আর কিছুটা অ্যাকশনও। নইলে এখনকার দর্শকদের ভালো লাগবে না।

'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে' যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা জানেন, এই ছবির একটা টানটান অংশ হল ক্লাইম্যাক্সে ট্রেনের দৃশ্যটা। এই গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্যটাকে যে একটু বিশেষভাবে তুলতে হবে, সেটা আমরা আগে থাকতেই স্থির করে রেখেছিলাম। এখানে ওই দৃশ্যটার শুটিং-এর কথাই বলা যাক।

'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে' বাবা লেখেন ১৯৭৬ সাল নাগাদ। বাবার উপন্যাসে ওই ট্রেন-কাণ্ড ঘটছে লোনাভালা-খাণ্ডালা যাওয়ার রেলপথে। তখনও ওই লাইনে স্টিম ইঞ্জিন যাতায়াত করত। কিন্তু শুটিং শুরু হতে বুঝলাম, মহারাষ্ট্রে ওই দৃশ্যের শুটিং করতে সমস্যা হবে। এর একটা প্রধান কারণ অবশ্যই ছবির বাজেট। মুম্বই এবং সন্নিহিত যে কোনও এলাকায় একটা ছোটখাট শুটিং করতে গেলেই অসম্ভব বেশি 'চার্জ' গুনতে হয়। যেটা একটা বাংলা ছবির পক্ষে খুবই অসুবিধাজনক। সেখানে একটা গোটা ট্রেন নিয়ে একটা রেলপথ আটকে শুটিং করা।

তাছাড়া মুম্বইয়ে ছবি তুলতে গেলে প্রত্যেক জায়গায় তিন-চারবার করে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন হচ্ছিল। সে আর এক বড় ঝামেলা। মুম্বই সন্নিহিত এলাকায় ট্রেনের দৃশ্যটার শুটিং করার ইচ্ছে অতএব বাদ দিতে হল। তখন আমরা এমন আর একটা জায়গা খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে শুরু করলাম, যেখানকার সঙ্গে ওই লোনাভালা-খাণ্ডালার একটা ভৌগোলিক মিল অন্তত পাওয়া যায়।

গল্পের খাতিরেও ওই পরিবর্ত জায়গাটার আর একটা বৈশিষ্ট্য আবশ্যিক হয়ে পড়েছিল। রেল লাইনের একটা ধার বরাবর বাঁধানো রাস্তা। গল্পতে আছে, ওই রাস্তার ওপরেই থাকবে 'জেট বাহাদুর' ছবির শুটিং-এর চলন্ত জিপ। তার ওপর ক্যামেরা, এবং তাতে চোখ লাগিয়ে ক্যামেরাম্যান 'ফলো' করবে ট্রেনের পাশাপাশি ঘোড়ার ওপর সওয়ার স্টান্টম্যান ভিক্টর পেরুমলকে। এমন একটা দুর্দান্ত দৃশ্যের লোকেশন খুঁজে বের করার কাজে আমাদের ছবির প্রযোজক অর্থাৎ ঊষাকিরণ মুভিজ-এর লোকজনও আমাদের অনেকটাই সাহায্য করেছিলেন। তাঁরা বেশ কিছু পছন্দসই জায়গার ভিডিও ছবি তুলে এনে আমাদের দেখিয়েছিলেন। আমরা নিজেরাও বেশ কয়েকটি জায়গা দেখেছিলাম।

ঊষাকিরণ মুভিজ অন্ধ্রপ্রদেশের সংস্থা। সংস্থার তরফ থেকে আমাদের বলা হয়েছিল, ট্রেন নিয়ে শুটিং করতে যেহেতু বেশ কিছু সরকারি বাধ্যবাধকতা থাকে, ওঁদের রাজ্যে শুটিং হলে সেগুলো তাঁরা সহজেই মিটিয়ে ফেলতে পারেন। কারণ ঊষাকিরণ তথা রামোজি ফিল্মসিটির মালিক রামোজি রাওয়ের অন্ধ্রের সরকারি স্তরে কিছুটা সুনাম আছে। এমনকি অন্ধ্রে না হয়ে শুটিংটা পাশের রাজ্য কর্ণাটকের বাঙ্গালোরে বা কাছাকাছি কোথাও হলে পরিস্থিতি তাঁদের আয়ত্তে থাকে।

শেষপর্যন্ত বহু জায়গায় ঘোরাঘুরি করে, বেশ কিছু অঞ্চলের ভিডিও ছবি দেখে যে জায়গাটা আমরা পছন্দ করলাম, সেটা আরাকু ভ্যালিতে গোরাপুর স্টেশনের কাছাকাছি একটা এলাকা। 'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে' দেখলেই বোঝা যাবে, জায়গাটার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অসাধারণ। ওখানে পৌঁছানোর জন্যে ভাইজাগ থেকে কয়েক ঘণ্টার যে রেলযাত্রা সেটাও অতি মনোরম। আর ওই লোকেশনের সঙ্গে লোনাভালা-খাণ্ডালা এলাকার যে একটা দৃশ্যগত মিল রয়েইছে, সেটা আর বলার প্রয়োজন হয় না।

'বোম্বাইয়ের বোম্বেটে'র শুটিং-এর কথা বলতে বসে আমার মনে পড়ে যাচ্ছে বাবার সোনার কেল্লা ছবির কথা। সেখানেও ট্রেন নিয়ে একটা রোমাঞ্চকর দৃশ্যের ছবি তুলতে হয়েছিল। লোকেশনটা যোধপুর-জয়শলমির লাইনের মাঝামাঝি পোখরান থেকে আরও কুড়ি মাইল পশ্চিমে। রেল লাইনের পাশে সেখানেও ছিল পাকা রাস্তা। গোটা শুটিং পর্বটাই ছিল নানারকম চমকপ্রদ ঘটনায় পরিপূর্ণ। তবে আমার মনে হয়, সোনার কেল্লা-র ট্রেনের দৃশ্যটা 'শুট' করার জন্য বাবাকে খুব বেশি ঝুটঝামেলা পোয়াতে হয়নি। এত রকম অনুমতি-টনুমতি নেওয়ার ব্যাপারও তখন ছিল না। রেলের কর্তাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বাবা তো একটা আস্ত

ট্রেনই জোগাড় করতে পেরেছিলেন শুধুমাত্র জ্বালানি খরচা দেওয়ার শর্তে। আর আমাদের বেলায় প্রতি ঘণ্টা হিসেবে রেলকে যে টাকাটা দিতে হল সেটা একটা বিরাট অঙ্ক। অন্তত কোনও বাংলা ছবির বাজেটের পরিপ্রেক্ষিতে।

তো, বোম্বাইয়ের বোম্বেটের কাহিনিকাল আমি ছবির খাতিরে গল্পের চেয়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে আনলেও, ট্রেনের দৃশ্যটায় স্টিম ইঞ্জিনই চেয়েছিলাম। আরাকু ভ্যালির মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে স্টিম ইঞ্জিনের 'কম্বিনেশন'টা বড় পর্দায় বেশ ভালো খুলবে বলেই মনে হয়েছিল। খোঁজখবর করে হায়দরাবাদে একটা স্টিম ইঞ্জিন পাওয়া গেল। কিন্তু শুনলাম সেটার আর বগি টানার ক্ষমতা নেই। তখন রেলের স্থানীয় এক কর্তা পরামর্শ দিলেন, অচল স্টিম ইঞ্জিনের পিছনে একটা ইলেকট্রিক ইঞ্জিন তিনি জুড়ে দেবেন, পিছনের বগিগুলোকে টানবে সেটাই। স্টিম ইঞ্জিনের চুল্লিতে কয়লা পুড়িয়ে নকল ধোঁয়াও ওড়ানো হবে। শুধু আমরা যদি ছবি তোলার পর এডিটিং-এর কারিকুরিতে ইলেকট্রিক ইঞ্জিনটা সিনেমায় বাদ দিতে পারি।

কিন্তু পরে কল্পনা করে দেখলাম, সামনে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে যাচ্ছে স্টিম ইঞ্জিন, পিছনে ইলেকট্রিক ইঞ্জিন, সব মিলিয়ে ব্যাপারটা অত্যন্ত বীভৎস হয়ে দাঁড়াবে। পর্দাতেও ট্রেনটাকে দূর থেকে দেখাতে সমস্যা। দুটো ইঞ্জিন কোনও না কোনও সময় দেখা যাবেই। কাজেই মত বদলে স্টিম ইঞ্জিন বাদ দেওয়াই স্থির হল।

লোকেশন হল, ট্রেন হল, এবার শুটিং। এবং এই পর্যায়টায় এসেই আমার আরও একবার সোনার কেল্লার ট্রেনের দৃশ্যের চিত্রগ্রহণের কথা মনে পড়ছে। আগেই বলেছি, পোখরানের কাছে একটা জায়গায় ওই দৃশ্যটার শুটিং হয়েছিল। ঠিক ছিল, আমরা জয়সলমির থেকে একশো মাইল রাস্তা মোটরে গিয়ে পোখরানে ওই ট্রেনটায় উঠব। ট্রেনটা আমাদের ইউনিটের সবাইকে নিয়ে শুটিং স্পটে যাবে। কিন্তু পোখরানে আমরা পৌঁছে দেখলাম ট্রেনই আসেনি। কাজের সময় যেখানে আগে থেকে হিসেব করে ঘণ্টা মিনিটের মাপে ভাগ করা থাকে, সেখানে দশ পনেরো মিনিট এদিক ওদিক হলেই হিমসিম খেতে হয়। আমাদের ট্রেন এল প্রায় তিনঘণ্টা পরে। এই তিন ঘণ্টা বাবা যে কী উৎকণ্ঠা নিয়ে কাটিয়েছিল সেটা আর বলার দরকার পড়ে না।

অনেকটা এমনই উৎকণ্ঠা আমাদেরও সহ্য করতে হল, যখন বিশাল ইউনিট নিয়ে গোরাপুরে পৌঁছে আমরা দেখলাম স্টেশন থেকে ট্রেন আর নড়ে না।

আগেই বলেছি ট্রেন ভাড়া করাটা অত্যন্ত খরচসাপেক্ষ, তার ওপর ওই বিশাল ইউনিটের লটবহর। কাজেই শুটিং করতে না পারলে পুরো ব্যাপারটাই মাটি। অথচ আট ঘণ্টার শুটিং শিফটে ট্রেনটা কেবল স্টেশনেই দাঁড়িয়ে রইল ছয় ঘণ্টা। জানা গেল, ঊষাকিরণ মুভিজের পক্ষ থেকে স্থানীয় রেলকর্তাদের যে চিঠি লেখা হয়েছিল, তাতে ট্রেনটাকে নিয়ে যে ঠিক কী করতে হবে, তা স্পষ্টভাবে লেখা হয়নি। অথচ আমি কলকাতা থেকে প্রযোজকদের আমার প্রয়োজনের কথাটা যথাযথভাবে লিখে জানিয়েছিলাম। এখন আমার মনে হয়, কলকাতা থেকে হায়দরাবাদ, এই বিশাল দূরত্বটার জন্যে ছোটখাট কাজেও এত চিঠিচাপাটি লিখতে হয়েছে, কয়েকটা 'কমিউনিকেশন গ্যাপ'-এর ঘটনা তাতে স্বাভাবিকভাবেই হয়ে গিয়েছিল। রেল বিভ্রাটটাও হয়তো ওই গোত্রে পড়ে।

যাই হোক, ট্রেন সেই স্টেশনেই দাঁড়িয়ে রইল। আমাদের ইউনিটের তরফ থেকে স্থানীয় রেল কর্তৃপক্ষকে বোঝানো, এদিক ওদিক ফোন করা ইত্যাদি চলল। পরে সমস্যাটা একটু মেটার মতো হতেই রেলকর্তাদের তরফ থেকে আমাদের লোকেশনে চলে যেতে বলা হল। ওঁরা বললেন, লাইন দিয়ে একটা গুড্স ট্রেন বেরিয়ে গেলেই আমাদের ট্রেনটাও শুটিং স্পটে গিয়ে হাজির হবে। সেইমতো আমরা লোকেশনে গিয়ে হাজির হলাম। ততক্ষণে অর্ধেক শিফট কাবার। তার ওপর আবার মাঝে মাঝে বৃষ্টি পড়ছে। পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে ততক্ষণে দুঃস্বপ্নের মতো ঠেকতে শুরু করেছে।

ক্লাইম্যাক্সের শুটিং বলে আমি তিনটে ক্যামেরার ব্যবস্থা করেছিলাম। তাতে তিনটে দৃষ্টিকোণ থেকে একসঙ্গে ছবি তোলা যাবে। সেগুলোকে রেডি করার কাজ শুরু হল। ঘোড়া এবং তাদের সওয়াররাও হাজির। রেডি ফেলু, জটায়ু এবং তোপসে, ভিক্টর পেরুমল, ফিল্ম ডিরেক্টর পুলক ঘোষালও। শুধু ট্রেনের দেখা নেই।

তবে এখন মোবাইল ফোনের সুবিধাটা রয়েছে। স্টেশনে একটা ফোন করতে জানানো হল, আর একটা গুড্স ট্রেন গেলে স্টেশন থেকে নড়বে আমাদের ট্রেনটা। বিরক্ত হলে চলবে না। যতটুকু সম্ভব কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার। একটা ইনস্পেকশন ট্রলি জোগাড় করে কয়েকটা ছোটখাট শট নেওয়া হল। তারপরে দেখা মিলল ট্রেনের। কিন্তু ততক্ষণে ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে গেছে। বেলা শেষ হয়ে আসছে, এবং মাত্র দু'ঘণ্টা সময়ের মধ্যে ট্রেন-ঘোড়া-জিপ নিয়ে ওই বিশেষ দৃশ্যের জন্য প্রয়োজনীয় কো-অর্ডিনেশন করা গেল না। কাজেই 'প্যাক আপ'।

ঘোড়া নিয়ে ট্রেন তাড়া করার দৃশ্যটা তোলার জন্য তাই আমাদের আর একবার আরাকু যেতে হল। সেটা দু-একমাসের মধ্যেই। নইলে বর্ষা পেরিয়ে যেত এবং আগেকার তোলা দৃশ্যের সঙ্গে পরেরগুলো মেলানো যেত না। বর্ষার আকাশে সূর্য আর মেঘের লুকোচুরিতে যে মৃদু আলো তৈরি হয়, এবং যা রঙিন ফোটোগ্রাফির পক্ষে একেবারে আদর্শ, সেটাও পাওয়া যেত না। বাবা এই আলোটা ভীষণ পছন্দ করতেন।

প্রথমবারের ভয়ানক অভিজ্ঞতা আমাদের শিখিয়ে দিয়েছিল অনেক কিছু। এবারে রেল কোম্পানিকে প্রযোজক ট্রেন ভাড়া করার জন্য যে চিঠি পাঠালেন, সেটা আমি আগে ভালো করে দেখে নিয়েছিলাম। ফল হল এই, দ্বিতীয় পর্বে খোদ রেলের কয়েকজন বড় কর্তা শুটিং দেখতে হাজির হলেন। এবং তাঁরা থাকার জন্যই হয়তো ট্রেনটাও খুব ভদ্র ব্যবহার করল। ট্রেন-ঘোড়ার দুর্দান্ত দৃশ্যটাও উতরে গেল সহজেই।

ছবি তুলতে
কত তোড়জোড়

সোনার কেল্লা, জয় বাবা ফেলুনাথ এবং বোম্বাইয়ের বোম্বেটে—এই তিনটে ছবিতেই একটা ছোট মিউজিক 'পিস' ঘুরে ফিরে এসেছে। ওটাই ফেলুদা সিরিজের 'থিম মিউজিক'। এখন তো মোবাইল ফোনের রিং টোন হিসেবেও এই থিমটা মাঝে মধ্যে শুনতে পাই। অবশ্য রিং টোনটা যাঁরা তৈরি করেছেন, তাঁরা থিমটার কপি রাইট নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাতে চাননি। অর্থাৎ আমাদের কাছ থেকে কোন অনুমতি নেওয়া হয়নি।

জেমস বন্ড সিরিজের থিম মিউজিকটা তো খুবই পরিচিত। গড ফাদার কিংবা হালফিলের স্পাইডারম্যান ছবির সিরিজেও এমন থিম মিউজিক ঘুরে ফিরে আসে। আসলে কোনও একটা ছবি বা সিরিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে এই ছোট ছোট আবহগুলো খুব সাহায্য করে। একটা গোটা চলচ্চিত্রের ঘটনাক্রমকেও তা বেঁধে রাখতে পারে, অবশ্যই তার ব্যবহারটা যথাযথ হতে হবে। প্রফেসর শঙ্কুর গল্প নিয়ে ভবিষ্যতে যদি কোনও ছবি করি, তবে তাতেও থিম মিউজিক থাকবে। অথচ আমার ভাবতে অবাক লাগে, অন্যান্য বাংলা ছবিতে এর ব্যবহারটা এখনও কেউ সেভাবে করার প্রয়োজনই মনে করলেন না।

ফেলুদার থিম মিউজিকটা বাবাই কম্পোজ করেছিলেন। ওঁর সংগীত রচনার ধরনটা ছিল অন্যদের থেকে একেবারে আলাদা। খুব ভালো শিস দিতে পারতেন। সংগীতের প্রাথমিক খসড়াটা উনি শিস দিয়েই তৈরি করতেন। গভীর রাতে বহুদিন বাবার ঘর থেকে মৃদু শিসের আওয়াজ পেয়েছি। আসলে বাড়িতে সারাদিন বহু মানুষের আনাগোনা লেগে থাকত। তাদের সামনে তো আর শিস দিয়ে সুর ভাঁজা যায় না। রাতে পরিবেশ অনেক শান্ত হয়ে আসত। অখণ্ড মনযোগ সংগীতে দিতে পারতেন বাবা।

শিস দিয়ে সুরের কাঠামোটা তৈরি হয়ে যাওয়ার পর বাবা সেটাকে পিয়ানোতে বাজাতেন। তারপর তৈরি হত স্বরলিপি। একটা ছোট মিউজিক পিসের মধ্যেও

চার পাঁচ রকমের যন্ত্রের ব্যবহার থাকতে পারে। এ রকম ক্ষেত্রে প্রত্যেকটা যন্ত্রের জন্য আলাদা আলাদা করে 'স্কোর' তৈরি করতেন বাবা। এবং তা এতটাই নিষ্ঠার সঙ্গে, কল্পনা করা যায় না।

স্বরলিপির প্রসঙ্গ যখন এল, তখন আর একটা ঘটনার কথা বলা প্রয়োজন। এর থেকে বোঝা যাবে ওঁর 'অ্যাডাপ্টেবিলিটি', অর্থাৎ কাজের পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়ার কী সাংঘাতিক ক্ষমতা ছিল।

সংগীত নিয়ে বাবার পড়াশোনার পরিধি ছিল বিরাট । আর সংগীতের চর্চা যেটা ছিল, সেটা পুরোপুরি নিজে নিজে আয়ত্ত করা। শান্তিনিকেতনের কলাভবনে থাকার সময় থেকেই উনি পাশ্চাত্য সংগীতে ভীষণ ভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। রাত্রে ওয়েস্টার্ন সিম্ফনির স্কোর নিয়ে শুতে যেতেন, গভীর রাত পর্যন্ত সেটাকে বিশ্লেষণ করা ছিল ওঁর ওই সময়ের অন্যতম 'হবি'।

আগে কলকাতায় বড়বড় রেকর্ডের দোকানে ওয়েস্টার্ন নোটেশনে সংগীত রচনার উপযোগী ফাঁকা 'স্কোর শিট' কিনতে পাওয়া যেত। বাবা সেই স্কোর লেখার কাগজ কিনে আনতেন প্রায়ই। এরপর বাড়িতে বসে কোনও মিউজিক শুনতে শুনতে তার স্কোরটা তিনি ওই কাগজে লিখে ফেলতেন। স্বরলিপি তৈরির চর্চাটা এইভাবেই বজায় রেখেছিলেন।

ওয়েস্টার্ন মিউজিকের পথে হেঁটে যাঁর সংগীত জগতে প্রবেশ, সংগীত রচনার ক্ষেত্রেও তাঁর পাশ্চাত্য পদ্ধতিই অবলম্বন করাই উচিত। সেটাই স্বাভাবিক। বাবার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। উনি সংগীত রচনা করতেন 'ওয়েস্টার্ন নোটেশনে'। ভারতে কিন্তু ব্যবহৃত হয় 'ইন্ডিয়ান নোটেশন'। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের জটিল রাগ রাগিণীও উনি ওয়েস্টার্ন নোটেশনেই তুলে আনতেন। তাতে কিন্তু এখানকার যন্ত্রীদের একটু অসুবিধা হত।

সংগীত রেকর্ডিং এর সময় একজন দক্ষ মিউজিক অ্যারেঞ্জারের প্রয়োজন হয়। অ্যারেঞ্জারের কাজ হল, রচয়িতার ভাবনা অনুযায়ী সংগীতশিল্পী এবং যন্ত্রীদের নিয়ে ঠিকঠাক সংগীতটা নির্মাণ করা। বাবার মিউজিক অ্যারেঞ্জার ছিলেন অলোক নাথ দে। একজন অত্যন্ত দক্ষ এবং গুণী মানুষ। ওঁর ছেলে তপনও এখন নামকরা অ্যারেঞ্জার। তপন আমার বোম্বাইয়ের বোম্বেটে ছবিতে কাজ করেছেন।

ওয়েস্টার্ন নোটেশনে বাবা যে সংগীত রচনা করতেন, অলোকদা সেটাকে ইন্ডিয়ান নোটেশনে লিখে দিতেন। তাতে মিউজিসিয়ানদের খুব সুবিধা হয়ে যেত। কারণ অনেকেই ওয়েস্টার্ন নোটেশনের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিলেন না। আবার বাবা ইন্ডিয়ান নোটেশনটা তেমনভাবে জানতেন না।

এইভাবেই যা হোক করে চলছিল। কিন্তু বাবা প্রথম বড়সড় অসুবিধার মুখোমুখি হলেন গুপি গাইন বাঘা বাইন ছবিতে। ওটা পুরোপুরি মিউজিক্যাল ছবি। প্রচুর গান, আবহের ব্যবহার রয়েছে। গানগুলোয় আবার ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের রাগ রাগিণীর ছোঁওয়া। এবং বাবা সেগুলোকে যথারীতি ওয়েস্টার্ন নোটেশনে ভেঙে শব্দযন্ত্রীদের বোঝাতেই অলোকদা হিমশিম খেয়ে গেলেন। সময়ও প্রচুর গেল, যা একটা বাংলা ছবির বাজেটের পক্ষে সত্যিই অসুবিধাজনক।

এরপর অবাক কাণ্ড। রাতারাতি বাবা ইন্ডিয়ান নোটেশনে স্বরলিপি তৈরি করা শিখে নিলেন। পরের ছবিগুলোতে উনি যে সংগীত রচনা করেন, তার সবই ভারতীয় মতে লেখা। এত দ্রুত কী করে যে উনি এই নোটেশনে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন, তা আজ বসে ভাবতেও অবাক লাগে।

প্রযুক্তির উন্নতির জন্য সাউন্ড রেকর্ড করার কাজ এখন অনেক সোজা হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ যন্ত্রানুষঙ্গের গুণমান এখন আর কারওর ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের ওপর ততটা নির্ভর করে না। অনেক ত্রুটি যান্ত্রিকভাবে পুষিয়ে দেওয়া যায়। বাবার সময়ে কিন্তু কাজটা অনেক শক্ত ছিল। তবে অলোকদার মতো সহযোগী পেয়ে ওঁর অনেক সুবিধা হয়ে গিয়েছিল।

অলোকদা ঠিক কতটা দক্ষ ছিলেন? একটা ছোট উদাহরণ দিই। একটা ছোট্ট আবহ সংগীতও অনেক রকম গতিতে বাজানো এবং রেকর্ড করা যায়। একটা সুর দ্রুত বাজবে না ধীর লয়ে, সেটা নির্ভর করে তার মাত্রার ওপর। অর্থাৎ মাত্রা বাড়িয়ে কমিয়ে সংগীতের 'পেস' বদলানো যায়।

সংগীত রেকর্ডিংয়ের সময় 'মেট্রোনম (metronome)' বলে একটা ছোট যন্ত্রের ব্যবহার হয়, যেটা মিউজিক অ্যারেঞ্জারের কানের কাছে 'ক্লিক ক্লিক' করে আওয়াজ করে তাঁকে সংগীতের মাত্রাটা ধরিয়ে দেয়। আগে কিন্তু এই আওয়াজটা কানের পাশে হেডফোনে শোনা যেত না। রেকর্ডিংয়ের আগে মেট্রোনমে একবার মাত্রাটা শুনে নিতেন অ্যারেঞ্জার। তারপর রেকর্ডিংয়ের সময় সেটাকে স্মরণ করেই তাঁকে কনডাক্ট করতে হত। ধরা যাক কোনও ছবির এক বিশেষ দৃশ্যের জন্য একটা পাক্কা এক মিনিট সাত সেকেন্ডের ছোট আবহ প্রয়োজন। আবহের দৈর্ঘ্য একচুল এদিক ওদিক হলে কিন্তু ওই দৃশ্যে সেটাকে আর ব্যবহার করা যাবে না। কারণ আবহের দৈর্ঘ্য স্থির করা হয়েছে ছবিতে কোনও একটা বিশেষ মুহূর্তের দৈর্ঘ্য মেপে। এই ধরনের রেকর্ডিংয়ের সময় একাধিক 'টেক' নেওয়া হয়। তিন চারটে তো কম করে। অবাক হয়ে দেখেছি, এই প্রত্যেকটা টেকই অলোকদা শেষ করতেন

নিখুঁত সময়ের মাপে। এটা একদম অনন্য একটা দক্ষতা। বাবাও এটার খুব কদর করতেন। এখন অবশ্য পুরো ব্যবস্থাটাই অনেক বদলে গিয়েছে। আবহের দৈর্ঘ্য কিছুটা এদিক ওদিক হলেও সেটাকে ব্যবহার করার অনেক উপায় বেরিয়েছে।

বোম্বাইয়ের বোম্বেটে ছবিতে আমরা ডিজিটাল সাউন্ড করেছি। পরে সেটাকে ডলবিতে তোলা হয়। গোটা ব্যাপারটা কিন্তু বেশ জটিল। একটা ছোট ঘটনার কথা বলি, তাতেই শব্দগ্রহণের ঘনঘোর চরিত্র কিছুটা বোঝা যাবে।

বোম্বাইয়ের বোম্বেটের টাইটেল রোল আসার আগে, ছবির একদম প্রথমের দিকে, একটা গাড়ি বিস্ফোরণের দৃশ্য আছে। ওই আওয়াজটায় অনেকেরই শুনেছি বুক কেঁপে গিয়েছে। ছবিটা রিলিজের আগে আমিও খুব চিন্তায় ছিলাম, ওই আওয়াজ শুনে কেউ আবার না হলের মধ্যে হার্ট ফেল করে বসেন! ছবিটা হায়দরাবাদের রামোজী ফিল্ম সিটিতে তৈরি, পোস্ট প্রোডাকশনের সমস্ত কাজও ওখানেই হয়েছে। একদিন স্টুডিওতে একজন টেকনিশিয়ান বললেন, বিস্ফোরণের আওয়াজটা একটু শুনে যান।

একটা ঘরে গিয়ে শুনলাম। কিন্তু তাতে বিস্ফোরণ কী হল সেটা বিশেষ বুঝলাম না। আমি জিজ্ঞেস করতে স্টুডিওর একজন বললেন, এটা তো বিস্ফোরণের সময় যে হাওয়া বইবে, তার শব্দ। তাহলে আসল বিস্ফোরণের শব্দটা কোথায়? পাশের ঘরে গেলাম, সেখানে শুনি পাখির কিচিরমিচির। এটা আবার কোথা থেকে এল? শুনলাম, বিস্ফোরণের শব্দে ভয় পেয়ে পাখি উড়ে যাবে জঙ্গলের গাছ থেকে। এটা তার শব্দ। অগত্যা তার পাশের ঘরে গেলাম বিস্ফোরণের আসল শব্দটা খুঁজতে।

আসলে ডিজিটাল পদ্ধতিতে আজকাল একটা সাধারণ শব্দও অনেকগুলো ট্র্যাকে, অনেকগুলো শব্দের মিশেলে তৈরি হয়। তাই প্রত্যেকটা শব্দই এত নিখুঁত লাগে। বিস্ফোরণের শব্দটা যেমন। ওর রেকর্ডিংয়ে যতই হয়রান হই না কেন, পরদায় যে ওটা চমকে দিয়েছিল সে বিষয়ে তো কোনও সন্দেহ নেই।

এই ধরনের সাউন্ড সিস্টেমে কাজ করার অভিজ্ঞতা এর আগে আমাদের বিশেষ ছিল না। কলকাতা থেকে অনুপ মুখোপাধ্যায় আমাদের সঙ্গে গিয়েছিলেন। উনি এই কাজে একজন বিশেষজ্ঞ, এন এফ ডি সি তে ছিলেন। আগে উনি আমাদের ছবিতে কাজ করেছেন, তবে এবার আমাদের ইউনিটে ছিলেন না। বোম্বাইয়ের বোম্বেটের প্রাথমিক পর্যায়ের সম্পাদনা শেষ হওয়ার পর ওঁকে আমরা ছবিটা দেখিয়েছিলাম। তখনও ছবিটা পুরোপুরি নির্বাক। উনি দেখে

বললেন, 'এত রকম চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার স্যাপার রয়েছে, আমার এই কাজটা করতে খুব ইচ্ছে করছে।'

ওঁর মতো একজন অভিজ্ঞ লোক দলে আসায় আমাদের তো খুব সুবিধা হয়ে গেল। হায়দরাবাদেও দেখলাম সাউন্ড রেকর্ডিস্টরা ওঁকে 'স্যার স্যার' বলে ডাকছে। শব্দ পুনর্যোজনার টেকনিক্যাল দিকটা উনিই সামলালেন। কাজটা তো কম ঝক্কির নয়। অভিনেতাদের সংলাপ ডাবিং থেকে শুরু করে আবহ সংগীত, হাঁটাচলা, মারামারি এবং অন্যান্য বহু শব্দ।

আবহ সংগীত রেকর্ড করা হয়েছিল কলকাতায়। হায়দরাবাদের স্টুডিওতে বিভিন্ন ধরনের শব্দের একটা আর্কাইভের মতো রয়েছে। ওখান থেকেও বেশ কিছু শব্দ ব্যবহার করা হল। আমরাও বেশ কিছু স্টক সাউন্ডের ক্যাসেট এবং সি ডি নিয়ে গিয়েছিলাম। ওগুলো বাবা বিদেশ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন।

মারামারির দৃশ্যগুলোর জন্য আমি সাউন্ড এক্সপার্টদের বলেই দিয়েছিলাম, ঘুঁষোঘুঁষির আওয়াজ সামান্য প্রকট হবে, কিন্তু কখনওই বাজার চলতি সাধারণ ছবির মতো উৎকট নয়। ওঁরা কিন্তু সেটাই ঠিকঠাক করে দেখিয়েছেন। শব্দ তৈরির কাজটা পুরোপুরি হয়ে যাওয়ার পর গোটা ছবিটায় সেটাকে 'মাস্টারিং' করার প্রয়োজন হয়। এটাই শব্দের চূড়ান্ত সম্পাদনা, কোথায় তা বেশি হবে বা কম, তীক্ষ্ণতা কোথায় কী হবে, কোন আওয়াজটা বাদ যাবে কোনটা থাকবে, সবকিছু ঠিক হয় এই মাস্টারিংয়ের সময়। এই সিস্টেমে আরও একটা ব্যাপার থাকে। মূল আওয়াজটা ছবিতে অনেকগুলো ভাগে ভাগ হয়ে যায়। অর্থাৎ কিনা, ছবিতে পর্দার ডান দিকে একটা দরজা হয়তো বন্ধ হল। সিনেমা হলে সে আওয়াজটা পাওয়া যাবে ডানদিকের সাউন্ড সিস্টেম থেকেই। এই জটিল কাজটাও মাস্টারিংয়ের সময় চূড়ান্তভাবে করা হয়। গোটা ছবিতে এই বিরাট ঝক্কিটা সামলেছিলেন অনুপদা। পরে এই সাউন্ডকে ডলবিতে তুলে নিয়েছিলেন মুম্বইয়ের এক প্রবাসী বাঙালি প্রোফেশনাল। বলাই বাহুল্য, তিনি ডলবি সংস্থার সঙ্গে যুক্ত।

ভারতে অধিকাংশ ছবিতেই ডাবিং করা হয়। অর্থাৎ শুটিংয়ের সময়কার শব্দ ছবিতে ব্যবহৃত হয় না, সেটাকে একটা 'গাইড ট্র্যাক' হিসেবে রেকর্ড করা হয়। পরে ডাবিং থিয়েটারে এই গাইড ট্র্যাকের সঙ্গে মিলিয়ে এবং মনিটরে নিজেদের অভিনয়ের সময়ের অভিব্যক্তি দেখে অভিনেতা অভিনেত্রীরা সংলাপ বলেন। সেটাই ছবিতে ব্যবহৃত হয়। হলিউডের অধিকাংশ ছবিতেই কিন্তু শুটিংয়ের সময়ের শব্দই ছবিতে রাখা হয়। এটাকে বলা হয় 'সিঙ্ক সাউন্ড'। মজার কথা,

আগে আমাদের এখানে যে সব ছবি হত, তাতে কিন্তু এই সিঙ্ক সাউন্ডই ব্যবহৃত হত। পথের পাঁচালীও পুরোপুরি সিঙ্ক সাউন্ডে তোলা।

আমাদের এখানে সিঙ্ক সাউন্ডের ব্যবহার যে একটা সময়ে প্রায় বন্ধ হয়ে আসে, তার কারণ কিন্তু ক্যামেরা। অধিকাংশ ক্যামেরাই অত্যন্ত পুরনো, চললে একটানা শব্দ হয়। সেই সব ক্যামেরা ব্যবহার করলে সিঙ্ক সাউন্ড করা যাবে না।

একটা সময়ের পর থেকে বাবা পুরোপুরি অ্যারিফ্লেক্স ক্যামেরায় কাজ করেছেন। আমিও করেছি। ফেলুদার সব ছবিই অ্যারি-তে তোলা। অ্যারির বিশেষ কয়েকটা মডেলে কিরকির করে একটা মৃদু শব্দ হয়। তাতে শুটিংয়ের শব্দ নিতে অসুবিধা হয়ে যায়। তাই বাধ্য হয়ে পরে ডাবিং করতে হয়েছে। তবে ব্লিম্প (blimp) নামে একটা জ্যাকেটের মতো জিনিস আছে, যেটা ক্যামেরার গায়ে পরিয়ে দিলে ওই শব্দটা আর বাইরে থেকে শোনা যায় না। তখন সিঙ্ক সাউন্ড করতে আর অসুবিধা থাকে না। আমরা বেশ কয়েকটা ছবিতে এইভাবে কাজ করেছি। গণশত্রু, শাখাপ্রশাখা, আগন্তুক ছবিতে শুটিংয়ের মূল আওয়াজই ছবিতে রাখা হয়েছে। ডাবিং করলে আওয়াজ অনেক পরিষ্কার হয় ঠিকই, তবে সিঙ্ক সাউন্ডের কোনও বিকল্প নেই। স্টুডিওতে তৈরি শব্দে তো আর পুরোপুরি স্বাভাবিকত্ব আসে না।

ক্যামেরার কথা যখন এল, তখন 'স্টেডি-ক্যামে'র প্রসঙ্গ বাদ দেওয়া অত্যন্ত অনুচিত হবে। হলিউডে তো বটেই, মুম্বইয়ের ছবিতেও বহুদিন ধরে ব্যবহৃত হচ্ছে এই বিশেষ ব্যবস্থাটি। স্টেডিক্যাম কিন্তু কোনও ক্যামেরা নয়, একটি বিশেষ যান্ত্রিক ব্যবস্থা, যার সঙ্গে এককটি মুভি ক্যামেরাকে লাগানো যায়। একটি হাইড্রলিক জাতীয় যন্ত্র ক্যামেরাটিকে ধরে থাকে, এবং তার জন্য ক্যামেরাম্যান বিস্তর হাঁটাচলা দৌড়োদৌড়ি করলেও ক্যামেরায় একটুও ঝাঁকুনি লাগে না। বোঝাই যাচ্ছে, 'চেজিং' এর দৃশ্যের জন্য এই জাতীয় ক্যামেরা একদম আদর্শ। সাধারণ মুভি ক্যামেরার নড়াচড়ার জন্য ট্রলি, ক্রেন ইত্যাদি লাগে। কিন্তু যেখানে মুভমেন্ট খুব বেশি, এবং এলোমেলো, সেখানে এই পদ্ধতিতে কাজ করা বেশ ঝক্কির। এই সব দৃশ্যে স্টেডি-ক্যাম ব্যবহার করা যায়। এটিকে ক্যামেরাম্যানের কোমরের সঙ্গে আটকে দেওয়া হয়। অর্থাৎ ক্যামেরাম্যান যেমন খুশি ক্যামেরাকে ঘোরাতে পারবেন। তবে স্টেডি-ক্যাম খুব ভারী হয়। যে ক্যামেরাম্যানের বয়স বেশি, তাঁর পক্ষে এটি চালানো শক্ত। একনাগাড়ে বহুদিন স্টেডি-ক্যাম চালালে শরীরেরও ক্ষতি হওয়ার আশংকা থাকে।

সবশেষে বলি বোম্বাইয়ের বোম্বেটের স্পেশাল এফেক্টের কথা।

শিবাজী কাস্‌ল বাড়িটাকে ঘিরেই তো ছবিটার যত কাণ্ড কারখানা। ফেলু তোপসে জটায়ু যখন তার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়, তখন ক্যামেরা 'টিল্ট আপ' করে, দেখা যায় বহুতলের বিশাল সাইনবোর্ডটা। শুটিংয়ের সময় কিন্তু বাড়িটার গায়ে ওই ধরনের কোনও সাইন বোর্ড লাগানো সম্ভব হয় নি। কিন্তু বোর্ড না থাকলেও মুশকিল। তাই ওটাকে পরে কম্পিউটর গ্রাফিক্সের সাহায্যে তৈরি করে দেওয়া হল।

এফেক্ট আরও আছে। শিবাজী কাস্‌ল-এর লিফ্‌টের ভিতর মারামারিটার কথা মনে আছে? নিমোর ঘুঁষি খেয়ে সেখানে একজন কাচের দেওয়ালে আছড়ে পড়বে, কাচ ভেঙে চুরমার হবে। এই দৃশ্যগুলোয় সত্যি কাচ ব্যবহার করলে রক্তারক্তি হওয়ার সম্ভাবনা, তাই এক বিশেষ ধরনের প্লাস্টিক ব্যবহার করা হয়। কিন্তু সব ব্যবস্থা নিয়েও কাচ ভাঙাটা ঠিক আমার মনের মতো হচ্ছিল না। তাই শেষ পর্যন্ত কোনও কিছু না ভেঙেই দৃশ্যটা শ্যুট করা হয়। পরে গ্রাফিক্সের সাহায্যে কাচ ভাঙা দেখানো হয়।

গাড়ি বিস্ফোরণের দৃশ্যেও আছে গ্রাফিক্স। বিস্ফোরণের শব্দে ভয় পেয়ে উড়ে গেল পাখির দল। পাখিগুলো কম্পিউটারে তৈরি।

তবে ভাগ্য ভাল, কেউই এই সব ফাঁকিগুলো ছবি দেখার সময় ধরতে পারেন নি। এখন রহস্য ফাঁস করে দিলাম।

চলচ্চিত্রের আনাচে কানাচে এমন বহু রহস্য লুকিয়ে থাকে। সিনেমার পরদায় আমরা ছবির যে প্রোজেকশন দেখি, সেটাও তো একটা বড়সড় এফেক্ট। আসলে তো সব ফ্রেমই 'স্টিল'। কিন্তু একের পর এক মুহূর্তের এমন বহু 'স্টিল' যখন পরপর আমাদের চোখের সামনে দিয়ে যায়, সংলাপ সংগীত শোনা যায়, তখন একটা 'ইলিউশন' তৈরি হয়। মনে হয় সত্যিই যেন ছবিটা নড়ছে, কথা বলছে। আর এই ইলিউশনটাই তো সিনেমা, 'দ্য গ্রেটেস্ট ফার্ম অব আর্ট'।

বাবা আর ফেলুদা

ফেলুদাকে নিয়ে লেখালিখি বলতে গেলে হঠাৎই শুরু করেন বাবা। আগে থাকতে সে রকম কোনও প্রস্তুতি ছিল না। সন্দেশ পত্রিকা নতুন করে প্রকাশিত হওয়ার পর ওঁকে এক রকম বাধ্য হয়েই কলম ধরতে হয়। আবির্ভাব হয় প্রফেসর শঙ্কুর। এর বহু আগে উনি চলচ্চিত্র বিষয়ক কিছু প্রবন্ধ লিখেছেন। দেশি, এমনকী সাইট অ্যান্ড সাউন্ডের মতো বিদেশি পত্রিকাতেও। দুটো গল্প লিখেছিলেন ইংরেজিতে, শেডস অব গ্রে এবং অবস্ট্রাকশন। সে দু'টো অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। পরে এই দুই গল্পের বঙ্গানুবাদ 'জবর বারো' সংকলনে গ্রন্থিত হয়েছে।

বাঙালি পাঠকদের মনে ফেলুদার জন্যে আজ ঠিক যে জায়গাটা তৈরি হয়েছে, তার কোনও আভাস কিন্তু গোড়ার দিকে বাবার পরিকল্পনায় ছিল বলে আমার একেবারেই মনে হয় না। প্রথম ফেলুদা কাহিনি যেটা লিখলেন ১৯৬৫ সালে, তার নাম 'ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি'। সেই গল্পে ফেলুর বয়স সাতাশ, তোপসের সাড়ে তেরো। সাতাশ বছর বয়সের এক বুদ্ধিমান যুবকের হাবভাব ঠিক যেমন হওয়া উচিত, ফেলু ঠিক তাই। অথচ বয়সোচিত চাপল্য তার মধ্যে থেকে তখনও উবে যায়নি, মাঝে মধ্যে তোপসেকে গাঁট্টাও মারে। এরপর 'বাদশাহী আংটি'। এই উপন্যাসেও ফেলুর স্বভাব প্রায় একই, এবং বাবা জানিয়েছেন সে একটি বেসরকারি সংস্থায় চাকরি নিয়েছে। অর্থাৎ গোয়েন্দাগিরিকেই পাকাপাকি ভাবে পেশা করে নেওয়ার পরিকল্পনাটা সে তখনও নেয়নি।

হয়তো বাবার মনেও এমন সম্ভাবনা তখনও উঁকি দেয়নি, অন্তত 'বাদশাহী আংটি' প্রকাশের আগে। কিন্তু লখনউ-এর পটভূমিকায় ফেলুর প্রথম উপন্যাসটা প্রকাশিত হতেই চারদিকে যেমন সাড়া পড়ে গেল, বাবা তাকে নিয়ে নতুন করে ভাবনা চিন্তা শুরু করতে প্রায় বাধ্য হলেন। পরের উপন্যাস 'গ্যাংটকে গণ্ডগোল' এবং সেখানে ফেলু দস্তুরমতো পাকা গোয়েন্দা।

ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি থেকে গ্যাংটকে গণ্ডগোল পর্যন্ত বাবার আঁকা সমস্ত ইলাস্ট্রেশন খুঁটিয়ে দেখলেও এই বিষয়টা বোঝা যায়। বাদশাহী আংটি পর্যন্ত ফেলুর মাথার চুল এলোমেলো, মুখে বেশ একটা সারল্যের ছাপ, পোশাক-আশাকও ততটা স্মার্ট নয়। অথচ গ্যাংটকে গণ্ডগোল থেকেই ফেলু অন্যরকম। কথাবার্তা, পোশাক আশাক চোস্ত, বন্ধ হয়েছে তোপসেকে গাঁট্টা মারাও। এবং ঠিক এই পর্যায়টা থেকেই বাবা ক্রমশ তাঁর নিজের চরিত্রের অনেক কিছু গোয়েন্দাকে ধার দিতে শুরু করলেন। ফেলুর মধ্যে আবছা ফুটে উঠতে লাগল বাবার অনেক অভ্যেস, পছন্দ অপছন্দ, এবং কখনও বাস্তবায়িত না হওয়া নিজের বেশ কিছু পরিকল্পনা। তবে সে প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে 'গ্যাংটকে গণ্ডগোল' কীভাবে লেখা হয়েছিল, সেই গল্পটা বলা যাক।

১৯৭০ সালের একেবারে গোড়ার দিক থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বী ছবিটা নিয়ে ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে পড়েন বাবা। ছবিটা রিলিজ করেছিল সে বছর অক্টোবর মাসে। এর ঠিক আগের বছর, অর্থাৎ ১৯৬৯ সালের মাঝামাঝি সময়ে প্রফেসর শঙ্কুকে নিয়ে বাবার প্রথম সংকলনটা প্রকাশিত হয়। বইটা বেরনোর কয়েক দিন পরে বাবা প্রযোজক আর ডি বনশলের ছেলের বিয়ের রিসেপশন পার্টিতে গিয়েছিলেন। ওখানে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যায় 'দেশ' পত্রিকার তখনকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষের সঙ্গে।

শঙ্কুর বইটা সাগরবাবু এর মধ্যেই পড়ে ফেলেছিলেন। এবং সেটা তাঁর এতই ভালো লেগেছিল, তিনি দেশ পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় একটা গোয়েন্দা উপন্যাস লেখার জন্য বাবাকে অনুরোধ করে বসলেন।

বাবা তো এই প্রস্তাব শুনে অবাক, শেষটায় হেসেই ফেলেন। ওই পত্রিকা মোটামুটিভাবে প্রাপ্তমনস্কদের জন্য, কিন্তু বড়দের জন্য তো উনি বিশেষ লেখেন না। বাবা বোঝানোর চেষ্টা করলেন, বড়দের জন্য তেমন কোনও পরিকল্পনা মাথায় এলে তার থেকে তিনি উপন্যাস লিখবেন না, ছবি করবেন। কাজেই তাঁকে দিয়ে লেখানোর আশা ছেড়ে দেওয়াই ভালো। কিন্তু সম্পাদক মশাই শুনলে তো!

আমার আবছা মনে আছে, সাগরবাবু এর পর থেকে বাড়িতে ঘনঘন টেলিফোন করতেন। বাবা তখন প্রতিদ্বন্দ্বী ছবির শুটিং শুরু করে দিয়েছেন। তাই প্রতিবারই সম্পাদকের প্রস্তাবে না করতে হচ্ছে। তবু টেলিফোন আসতেই থাকে। এরপর একদিন সশরীরে আমাদের বাড়িতে হাজির সাগরময় ঘোষ, হাই ব্লাড

প্রেসার নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে সোজা আমাদের তেতলার বসার ঘরে। বেশ হাঁপাচ্ছেন। বাবা তো ওঁকে ওই অবস্থা দেখেই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

শেষতক সাগরবাবুর জেদের কাছে এক রকম হার স্বীকার করেই বাবা একটা রফায় এলেন। সাগরবাবুকে বললেন, ছোটদের জন্য গোয়েন্দা উপন্যাস যদি চলে, তাহলে উনি ভেবে দেখতে পারেন। সে প্রস্তাব মেনে নেন সাগরবাবু। তিনি জানান, পুজো অক্টোবরে, সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে লেখা দিলেই চলবে।

এর পর অবাক কাণ্ড। বাবা লেখা শুরু করার আগেই ফলাও করে কাগজে বিজ্ঞাপন বেরিয়ে গেল, পুজো সংখ্যায় সত্যজিৎ রায় গোয়েন্দা উপন্যাস লিখবেন।

আগস্ট মাসের শেষের দিকে বাবা উপন্যাসের প্রথম খসড়াটা শেষ করলেন। তখন নাম ছিল 'গ্যাংটকে ফেলুদা'। মা আর আমাকে পড়ালেন। লেখাটা পড়ে ছোটখাটো দু'একটা খটকা মায়ের লেগেছিল, বাবা সেগুলো ঠিক করে দিলেন। তারপর খসড়া থেকে 'ফেয়ার' করে সেটা পত্রিকা অফিসে পাঠিয়ে দিলেন। উপন্যাসের নামটাও বদলে গেল। সেটা সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহ।

উপন্যাস প্রকাশিত হয়ে প্রচণ্ড জনপ্রিয় হল, এবং এক ধাক্কায় অনেকটা বদলে গেল যেন ফেলুদাও। এই প্রথম আমরা মোটামুটি 'ম্যাচিওর্ড' ফেলুকে পেলাম। আমার ধারণা, পত্রিকার পরিবর্তনের জন্যই এটা সচেতনভাবে ঘটিয়েছিলেন বাবা। কারণ দেশ পত্রিকায় যে উপন্যাস বেরচ্ছে, তা তো ছোটদের সঙ্গে বড়রাও পড়বে। সেখানে 'বালখিল্য' ভাবটা ফেলুর মধ্যে রাখলে চলবে কী করে?

একটা কথা বলে রাখা দরকার। সাগরবাবু বাবার লেখা পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু বাবার লেখা নেওয়ার জন্য ওঁর নাছোড়বান্দা মনোভাবের আরও একটা বড় কারণ ছিল। গোয়েন্দা ব্যোমকেশের স্রষ্টা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় মারা যান ওই ১৯৭০ সালের প্রথমের দিকেই। ওঁর রহস্য উপন্যাসগুলো বাঙালির কাছে ঠিক কতটা জনপ্রিয় ছিল, সেটা আর নতুন করে বলার দরকার পড়ে না। অনেকে ফেলুদার মধ্যে ব্যোমকেশের প্রচ্ছন্ন প্রভাব দেখতে পান। ব্যোমকেশের শেষ রহস্যোপন্যাস 'শজারুর কাঁটা' সাগরবাবুর পত্রিকাতেই ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় চলে যাওয়ায় বাংলা রহস্য উপন্যাসের প্রায় অনাথ হওয়ার অবস্থা হয়েছিল। সাগরবাবুর ব্যক্তিগত ধারণা ছিল, এই শূন্যস্থানকে নতুন চেহারা দেওয়ার ক্ষমতা একমাত্র বাবারই আছে।

ক্রমশ বাবার বেশ কিছু ব্যক্তিগত লক্ষণও পরের পর কাহিনিতে ফেলুদার মধ্যে ফুটে উঠতে লাগল। বাঁ হাতের কড়ে আঙুলের নখটা কাটতেন না বাবা। ফেলুদাও না। গোয়েন্দা চরিত্রের সঙ্গে বাবার শারীরিক সাদৃশ্য যে ক'টা ছিল, তার মধ্যে এটাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করি। এর পরেই আসছে উচ্চতার ব্যাপারটা। বাবা ছিলেন ছ'ফুট সাড়ে চার ইঞ্চি। ফেলুকেও উনি ছ'ফুটের ওপরেই রেখেছেন। ছ'ফুট দুই। তার দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত প্রখর। আর চোখদুটো খুবই ঝকঝকে। বাবারও দৃষ্টি ছিল প্রখর। গভীর ব্যক্তিত্ব। সরাসরি ওঁর চোখে চোখ রেখে কথা বলার মতো মানুষ আমি কমই দেখেছি।

চোখের প্রসঙ্গ যখন এল, তখন একটা মজার ঘটনার কথা না বলে পারছি না। সোনার কেল্লা ছবিটার শুটিংয়ের ঠিক আগেকার কথা এটা। সৌমিত্রকাকাকে ফেলুদা সাজিয়ে স্ক্রিন টেস্ট নেওয়ার পর প্রোজেকশন দেখে একটু চিন্তায় পড়লেন বাবা। ফেলুদার চোখ দুটো যতটা উজ্জ্বল হওয়া উচিত, ততটা লাগছে না।

এমনিতে সৌমিত্রকাকার চোখ বেশ ঝকঝকে। কিন্তু বাস্তব আর পরদার মধ্যে ফারাক তো একটা থাকেই। আবার চোখদুটো ঠিকমতো না হলে পরদায় ফেলুদার বুদ্ধিদীপ্ত চেহারাটা ঠিক খুলবে না।

পরে লক্ষ করে দেখা গেল, সৌমিত্রকাকার চোখের পাতা অত্যন্ত কম হওয়ার জন্যই এমনটা লাগছে। এই 'আইল্যাশ'ই ছবিতে চোখের 'আউট লাইন' তৈরি করে। তাই ওঁর চোখদুটো পর্দায় নিষ্প্রভ লাগছে।

তখন ঠিক হল, ওঁর চোখে নকল আইল্যাশ পরানো হবে। সাধারণত এটা মহিলা শিল্পীদের মেক আপের জন্যই ব্যবহৃত হয়। কিন্তু কী আর করা যাবে!

আইল্যাশ পরানোর পর কিন্তু সৌমিত্রকাকার মুখটা যা দেখতে হল, সে আর কী বলব! আসলে ফিল্ম মেক আপের জিনিসপত্র তখন কলকাতায় খুব একটা ভালো পাওয়া যেত না। আইল্যাশগুলো ছিল বেশ মোটা মোটা। কিন্তু ওই বিদঘুটে জবরজং মুখ তো আর ফেলুদা হতে পারে না। কাজেই আইল্যাশ কোনও কাজে লাগল না। এই ব্যাপারেই একটা আপসোস আজও আমার মনে রয়ে গিয়েছে। আইল্যাশ পরা সৌমিত্রকাকার একটা স্টিল ছবি আমার সেদিন তুলে রাখা উচিত ছিল। কেন যে তা করিনি, সেটা এখন আর ঠিক মনে পড়ে না!

শেষ পর্যন্ত সৌমিত্রকাকার নিজের চোখের পাতার ওপরেই ভারী করে

হাইলাইট করে দেওয়া হল। তাতেই যা হোক করে কাজ চালিয়ে নিলেন বাবা।

এবার ফেলুদার পছন্দের পোশাকের কথা বলা যাক। সবচেয়ে পছন্দের পোশাক ট্রাউজার্স এবং শার্ট। বাবাও এই কম্বিনেশনটা অত্যন্ত পছন্দ করতেন। বিশেষ করে শ্যুটিংয়ের সময় এই পোশাকটাই ওঁকে বেশি পরতে দেখেছি। শীতকাল হলে কাজের সময়ে একটা হালকা ধরনের জ্যাকেট চড়াতেন। লক্ষ করার বিষয়, ওঁর বহু ইলাস্ট্রেশনে ফেলুদাও জ্যাকেট পরেছে। এবং তার ধাঁচ অনেকটা বাবার জ্যাকেটের মতোই।

ট্রাউজার্সের ওপর শার্ট ছাড়াও প্রায়ই পাঞ্জাবি পরে ফেলুদা। বাবা অবশ্য এই পোশাকটা কোনওদিনই পরেননি। বাড়িতে ওঁর প্রিয় পোশাক ছিল পাঞ্জাবি আর পায়জামা। অনেক আগে গেরুয়া রঙের লম্বা পাঞ্জাবির ওপর ওঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। বাবা অবশ্য কোনওদিন জিনসও পরেননি, যেটা ফেলুদা খুবই পরেছে।

উৎসবে অনুষ্ঠানে কিন্তু বাবা ছিলেন খাঁটি বাঙালি। ধুতি পাঞ্জাবি পরতেন। ফেলুদাও সময় সুযোগ হলেই ধুতি পাঞ্জাবি পরে। 'গোলাপী মুক্তো রহস্য' কাহিনিতে তার গণ-সংবর্ধনা অনুষ্ঠানেও সে এই পোশাকই পরেছে। আর তোপসের বয়ান অনুযায়ী, ধুতি পাঞ্জাবিতে তাকে নাকি দিব্যি মানিয়ে গিয়েছে।

এ তো গেল বহিরঙ্গের কথা। বাবা তাঁর গোয়েন্দাকে নিজের চরিত্র এবং স্বভাবেরও অনেককিছু উপহার দিয়েছেন। আমরা দেখেছি, ফেলুদার মাথাটা অত্যন্ত ঠান্ডা। সহজে ঘাবড়ায় না, বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে 'মগজাস্ত্র'-এর ধার ভোঁতা হয় না। চট করে রাগেও না। বাবার মধ্যেও এই গুণটা ভীষণভাবে ছিল। অত্যন্ত ঠান্ডা মেজাজের মানুষ তো বটেই, ওঁকে সেভাবে কোনওদিন রাগতেও দেখিনি। আমাকে একবার বলেছিলেন, শান্তিনিকেতনে থাকার সময় শিল্পী নন্দলাল বসুর মানসিক স্থৈর্য নাকি ওঁকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল। নন্দলাল বসুর ড্রয়িংয়েরও ভীষণ ভক্ত ছিলেন বাবা। প্রথম জীবনে বাবা ওরিয়েন্টাল আর্টের রীতি মেনে যে সব ছবি এঁকেছেন, তাতে নন্দলাল বসুর শৈলীর প্রভাব রয়েছে। তবে এই নান্দনিক দিক ছাড়াও স্রেফ একজন মানুষ হিসেবে যে নন্দলাল বসু বাবাকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, সেটা ভাবতেই আমার ভীষণ 'ইন্টারেস্টিং' লাগে।

বাবার পড়াশোনার পরিধি নিয়ে তো আর নতুন করে বলার কিছু নেই। ব্ল্যাক

ম্যাজিক থেকে বিগ ব্যাং, পড়াশোনার বিষয়ের বৈচিত্র্য যে ঠিক কতটা ছিল সেটা ওঁর ঘরে একবার ঢুকলেই এখনও বোঝা যায়। দেশি বিদেশি পত্রপত্রিকা প্রচুর পড়তেন। ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক, লাইফ, ওমনি, সাইন্টিফিক অ্যামেরিকান, সাইট অ্যান্ড সাউন্ড ইত্যাদি কয়েকটি নাম এখনই মনে আসছে। এর বাইরেও রয়েছে প্রচুর পত্রপত্রিকা। ডাকযোগে বহু স্থানীয় পত্রিকার কপিও বাড়িতে আসত, এবং তার বেশির ভাগই যেত বাজে কাগজের ঝুড়িতে।

বাবার মতো এতটা না হলেও, ফেলুর পড়াশোনার 'রেঞ্জ'ও নেহাত কম নয়। এই পত্রিকাগুলোর মধ্যে অনেকগুলো ফেলুদাও পড়ে। ফেলুদাকে বিশেষভাবে টানে ভ্রমণকাহিনি। কোনও জায়গায় তদন্তে যাওয়ার আগে সেখানকার সম্বন্ধে ভালো করে পড়াশোনা করে নেওয়াটা হল ফেলুদার বরাবরের অভ্যেস। আসলে বাবাও ঠিক এটাই করতেন। সোনার কেল্লা বা জয় বাবা ফেলুনাথে রাজস্থান ও বেনারসের এমন অদ্ভুত বর্ণনা উঠে এসেছে, যে স্রেফ ওই দুটো বই হাতে নিয়েই বোধহয় ওই জায়গাগুলো ঘুরে আসা যায়। জেনে ফেলা যায় তাঁদের ইতিবৃত্ত। কোনও জায়গার ভূগোল ইতিহাসের কথা বাবা গল্প বলার ফাঁকে এমনভাবে বলতেন, মনেই হত না কেউ কোনও শিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা করছেন।

আসলে পাঠকদেরও বাবা তাঁর চিন্তাভাবনার শরিক করতে চাইতেন। যখনই কোনও নতুন জিনিস দেখতেন বা নতুন কিছু পড়তেন, এবং সেটা যদি ওঁর ভালো লাগত, ফেলুদা অথবা শঙ্কুর কাহিনিতে সেটা লেখার চেষ্টা করতেন। একটা উদাহরণ তো আমার এখনই মনে আসছে।

কল্পবিজ্ঞান লেখক মাইকেল ক্রিকটনের লেখা 'জুরাসিক পার্ক' উপন্যাসটা থেকে ছবি করেছিলেন স্পিলবার্গ। এর আগে ক্রিকটন দুর্দান্ত একটা উপন্যাস লিখেছিলেন, 'কঙ্গো'। সেটা পড়ে বাবার খুব ভালো লেগেছিল। এরপরেই তিনি শঙ্কুর অভিযান কঙ্গোতে নিয়ে গিয়ে ফেললেন, 'শঙ্কুর কঙ্গো অভিযান'।

এই প্রসঙ্গে বলা যায়, দেশ বিদেশের যে সমস্ত জায়গা থেকে বাবা সশরীরে ঘুরে এসেছিলেন, তাদের মধ্যে অনেকগুলোই ফেলুদার কাহিনির পটভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আর শঙ্কুর অ্যাডভেঞ্চার ঘটছে সেই সমস্ত জায়গায়, যেখানে ওঁর যাওয়ার ইচ্ছা ছিল খুবই, কিন্তু সে ইচ্ছা আর বাস্তবায়িত হয়নি। শঙ্কুর কাহিনিগুলোয় ফ্যান্টাসির প্রভাব বেশি বলেই হয়তো তার ঘটনাস্থল নিয়েও পুরোপুরি কল্পনার ওপরেই ভরসা রাখতেন।

ক্রিকটনের উপন্যাস পড়ে তো কঙ্গো নিয়ে খুবই উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন বাবা। অন্যদিকে লখনউ, দার্জিলিং, বেনারস, লন্ডন ছিল ওঁর অত্যন্ত পছন্দের জায়গা। ফেলুদার প্রথম দিককার তদন্তগুলো এই সব জায়গাতেই।

ফেলুদার কাহিনিগুলো লেখার সময় তাই কোনও জায়গার রেফারেন্স নিয়ে ওঁকে তেমন সমস্যায় পড়তে দেখিনি। যেটা খুবই হত শঙ্কুকে নিয়ে লেখার সময়। তখনও ইন্টারনেট আসেনি, সামান্য তথ্য খোঁজার জন্যও প্রচুর পড়াশোনা করতে হত। সব সময়ে বইপত্রও হাতের কাছে থাকত না। তবু এতটা পরিশ্রমের জন্যই শঙ্কুর কাহিনিতে ওঁর না দেখা জায়গার বিবরণ এত জীবন্ত, মানুষজন রাস্তাঘাটের নাম বা ভৌগোলিক বর্ণনাও একেবারে যথাযথ। সিনেমা হোক বা সাহিত্য, ডিটেইল নিয়ে ওঁর চিন্তাভাবনা সত্যিই ছিল দেখে শেখার মতো।

এখানেই শেষ নয়। শঙ্কুর কাহিনির ইলাস্ট্রেশন করতেও ওঁকে এই রেফারেন্সের সমস্যায় পড়তে হত। ন্যাশানাল জিওগ্রাফিক, নেচার ইত্যাদি পত্রিকাগুলো থেকে কিছুটা সাহায্য মিলত ঠিকই, কিন্তু তাতে পুরো প্রয়োজন মিটত না। একটা জায়গার বিবরণ বইয়ে পড়লেও তার হুবহু চেহারাটা বুঝতে কিন্তু সবচেয়ে আগে দরকার ছবি, যেটা সবসময় হাতের কাছে থাকত না। তবে বিদেশে ওঁর প্রচুর বন্ধুবান্ধব ছিলেন। তাঁদের অনুরোধ করতেন কোনও বিশেষ জায়গার ছবি বা পিকচার পোস্টকার্ড পাঠানোর জন্য। সে সব যখন ডাক মারফত হাতে এসে পড়ত, একেবারে ছোট ছেলের মতো আনন্দ করতে দেখেছি ওঁকে। ওই ছবিগুলোকে রেফারেন্স মেনে এরপর ঝটপট ইলাস্ট্রেশনের কাজ সেরে ফেলতেন।

ডিটেইল নিয়ে এত চিন্তাভাবনা করতেন বলেই টিনটিনের কমিকস এত প্রিয় ছিল বাবার। টিনটিনের স্রষ্টা হার্জের সহজ সরল আঁকার ভঙ্গিতে বিভিন্ন দেশ বা শহরের ছবি হুবহু উঠে এসেছে। হার্জের ইলাস্ট্রেশনের ভক্ত ছিলেন বাবা। প্রথম দিকে তো এই ফরাসি কমিকসের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়নি। পরে, ছ'য়ের দশকের শেষের দিকেই হবে বোধহয়, দার্জিলিংয়ে বেড়াতে গিয়ে একটা বইয়ের দোকানে হঠাৎই টিনটিনের ইংরেজি অনুবাদ আবিষ্কার করে ফেলি। হার্ড কভার এডিশন, স্পাইনে লাল কভার দেওয়া। বোধ হয় চার পাঁচ টাকা দাম ছিল। সেটা নিয়ে যখন হোটেলে ফিরলাম, বইটা দেখামাত্র উনি আমার হাত থেকে প্রায় কেড়ে নিয়ে গোগ্রাসে পড়ে ফেললেন। টিনটিনের পরের বইগুলোর ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে, অর্থাৎ আমার আগেই বাবা পড়ে নিয়েছেন।

ফেলুদাও কিন্তু টিনটিনের কমিকসের ভীষণ ভক্ত।

আমার ধারণা, এতটা শিশুসুলভ কৌতূহল এবং আগ্রহ শেষ বয়েস অবধি বাবার মধ্যে ছিল বলেই ওঁর সৃষ্টির সম্ভার এত বিচিত্র। আর ছিল একটা ভীষণ খোলা মন, অটুট ধৈর্য, লেগে থাকার ক্ষমতা, এবং খুঁটিনাটি কাজেও অসম্ভব যত্ন। অনেকেই জানেন না, প্রত্যেকটা গল্প বা উপন্যাসের খসড়া থেকে ফেয়ার করার কাজটা উনি নিজেই করতেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে একটা কাহিনির একাধিক খসড়া তৈরি করতেন। শেষের দিকে ওঁর শরীর যখন বেশ খারাপ, আমি বহুবার বলেছি, খসড়া থেকে ফেয়ার কপি আমি না হয় করে দিই। রাজি হননি। কারণ ফেয়ার করার সময়েও বহু খুঁটিনাটি পরিবর্তন উনি করতেন। সেটা অন্যের হাতে দিলে সম্ভব হবে কী করে? এত যত্ন যাঁর, তাঁর রচনা তো অন্যদের থেকে আলাদা হবেই।

পেশাদারি ব্যাপারে, অর্থাৎ টাকাপয়সার বিষয়ে বাবা চিরকালই অত্যন্ত উদাসীন ছিলেন। এক একটা ছবির পিছনে অক্লেশে কত পরিশ্রমই না করেছেন। মনের আনন্দেই করেছেন। একটা ভালো ছবি করার পর শিল্পী হিসেবে যেটুকু মানসিক তৃপ্তি, সেটাই সব ছিল ওঁর কাছে। কাজের বিনিময়ে পয়সাকড়ি কী পাওয়া গেল সেটা নিয়ে কোনওদিনই মাথা ঘামাননি।

তাছাড়া ঠিক কোন পরিচয়ে ওঁর টাকা নেওয়া উচিত হত? পরিচালক, চিত্রনাট্যকার, লেখক, সংগীত পরিচালক, নাকি পোস্টার ডিজাইনার? আর সব মিলিয়ে ধরলে তো একটা বিশাল পারিশ্রমিক দাঁড়ায়। কোনওদিনই তো পরিচালনার পাশাপাশি অন্যান্য কাজের জন্যে টাকাপয়সা দাবি করেননি। কোনও প্রযোজকও এ বিষয়ে ভাবেননি, আজ বলতেই হয়।

কী যে সব অবিশ্বাস্য কম বাজেটে এক একটা ছবি করেছেন, আমার তো আজকাল ভাবতেই অবাক লাগে। বাড়িতেও সাংসারিক হিসাবনিকাশ নিয়ে ভাবতেন না। টাকাপয়সার হিসেব থাকত না। কোথাও যাওয়ার হলে মায়ের কাছে গিয়ে টাকা চাইতেন। কারণ সংসারের সব হিসেব মা-ই রাখেন বরাবর। ফেলুদাও কিন্তু পয়সাকড়ির ব্যাপারে অত্যন্ত উদাসীন। নির্লোভ। শুধু কাজের চরিত্র নিয়েই ভাবে। প্রথমের দিকে তার দক্ষিণা হাস্যকর রকমের কম। পরে সেটা বেড়ে পাঁচশো হয়েছে, আরও পরে পাঁচ হাজার। হত্যাপুরী উপন্যাসে তোপসে তো বলেই দিয়েছে, 'কেস জমাটি হলে রোজগার হল কি না হল সেটা

ফেলুদা ভুলে যায়।'

এইভাবেই চলছিল। কিন্তু ফেলুদা আর শঙ্কুর ফরমায়েশি লেখা লিখতে বাবা যে ক্রমশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, সেটা বেশ বুঝতে পারতাম। অনেক সময়েই মাথায় সে রকম প্লট আসত না, কিন্তু জোর করে লিখতে হত। তাতে লেখাটার প্রতিও সুবিচার করা যেত না। এই কথা শেষের দিকে ফেলুদার কাহিনিতে লিখেওছেন বাবা। লেখা নিয়ে যে কষ্টের মধ্যে রয়েছেন, সেটা ওঁর সঙ্গে কথা বললেই বেশ বোঝা যেত।

এই সময়েরই একটা কথা আমার এখনও মনে আছে। বাবার শরীর তখন বেশ ভেঙে পড়েছে। বসার ঘরে ওঁর সঙ্গে কথা বলছিলাম। বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হয়ে আসছে। হঠাৎ উনি বললেন,

'ভাবছি এবার শঙ্কুকে মেরে ফেলব।'

বাবার মুখ থেকে যে এই ধরনের কথা কোনওদিন বেরোতে পারে, আমি ভাবতে পারিনি। মনটা এক মুহূর্তেই বেশ খারাপ হয়ে গেল। চুপচাপ বসেছিলাম, কোনও কথা বলতে ইচ্ছা করছিল না।

বাবা সেটা লক্ষ করে আবার বললেন, 'কোনও নতুন প্লট মাথায় আসছে না। বুঝতে পারছি না আর কোন নতুন জায়গায় নিয়ে গিয়ে শঙ্কুকে ফেলব। তাছাড়া শঙ্কুর বয়েস হয়ে গিয়েছে, সে তো মারা যেতেই পারে।'

—কিন্তু শঙ্কুর কাছে তো মিরাকিউরল রয়েছে। সে তো মরতে পারে না।

আমার কথাটা শুনেই যেন সংবিৎ ফিরল বাবার।

কিছুক্ষণ থেমে থেকে বিষণ্ণ গলায় বললেন, 'সে কথাও তো ঠিক। শঙ্কু মরতে পারে না।'

বাবার কাছে মিরাকিউরল ছিল না। যখন চলে যাওয়ার সময় এল, বহু চেষ্টা করেও আমরা তাঁকে রাখতে পারলাম না।

বেলভিউয়ে যখন শেষের ক'টা দিন কাটছে, তখন যতবারই ওঁর ঘরে ঢুকেছি, টেবিলের ওপর বই, কাগজপত্র ছড়ানো দেখে মনে হয়েছে হঠাৎ কোনও দরকারে বেরিয়েছেন, ফিরে এসে আবার কাজে বসবেন।

জীবিত অবস্থায় আর বাড়িতে ফেরা হয়নি ওঁর।

ভাবতে আশ্চর্য লাগে, নার্সিং হোমে ভর্তি হওয়ার কিছুদিন আগেই নিজের দুই প্রিয় চরিত্রকে নিয়ে কাজ উনি শেষ করেছিলেন। প্রথমটা ফেলুদার কাহিনি

'রবার্টসনের রুবি'। দ্বিতীয়টা ইংরেজিতে, অপুকে নিয়ে জীবনের এক বিরাট পর্যায়ের গল্প, 'মাই ইয়ার্স উইথ অপু।'

খসড়া অবস্থায় শেষ না হয়ে পড়ে ছিল কয়েকটা গল্পও। উনি চলে যাওয়ার কিছুদিন পর থেকে 'রবার্টসনের রুবি' এবং 'মাই ইয়ার্স উইথ অপু'র ফেয়ার কপিগুলো খুঁজে পাচ্ছিলাম না। পরে বুঝলাম ও দুটো চুরি হয়েছে।

ওই ইংরেজি লেখাটার খসড়া থেকে বহু চেষ্টায় একটা ফেয়ার তৈরি করেন মা। সেটাই প্রকাশিত হয়েছে।

খুবই আশ্চর্যের কথা, পরে আমাদের বাড়ি থেকে রবার্টসনের রুবি'র একটা দ্বিতীয় খসড়া পাওয়া গেল। এটার থেকে সংশোধন করেই বাবা চূড়ান্ত কপিটা তৈরি করেছিলেন, যেটা চুরি যায়। এই দ্বিতীয় খসড়া তৈরির কাজটা কিন্তু শারীরিক অবনতির জন্যেই উনি বহুদিন আগে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

এখনও ঠিক বুঝতে পারি না, কেন ওই কাহিনির দুটো খসড়া তৈরি করার দরকার হয়েছিল। তাহলে কি ফেয়ার কপিতে কাহিনিতে বড়সড় কোনও পরিবর্তন ঘটিয়েছিলেন? অন্য চেহারা পেয়েছিল রবার্টসনের রুবি?

ফেলুদার শেষ কাহিনি ঘিরে এই রহস্যটা সমাধানের অপেক্ষায় রইল।

সমাপ্ত

BDeBooks.com

Read Online

pdf

E-BOOK

www.BDeBooks.com
FB.com/BDeBooksCom
BDeBooks.Com@gmail.com